পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে—

দক্ষিণা-পথ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য-প্রণীত

বাণী সাহিত্য মন্দির,
১৯৯ সি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা ;
সন ১৩৩৪ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার
বাণী সাহিত্য মন্দির
১১৯ সি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্;
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

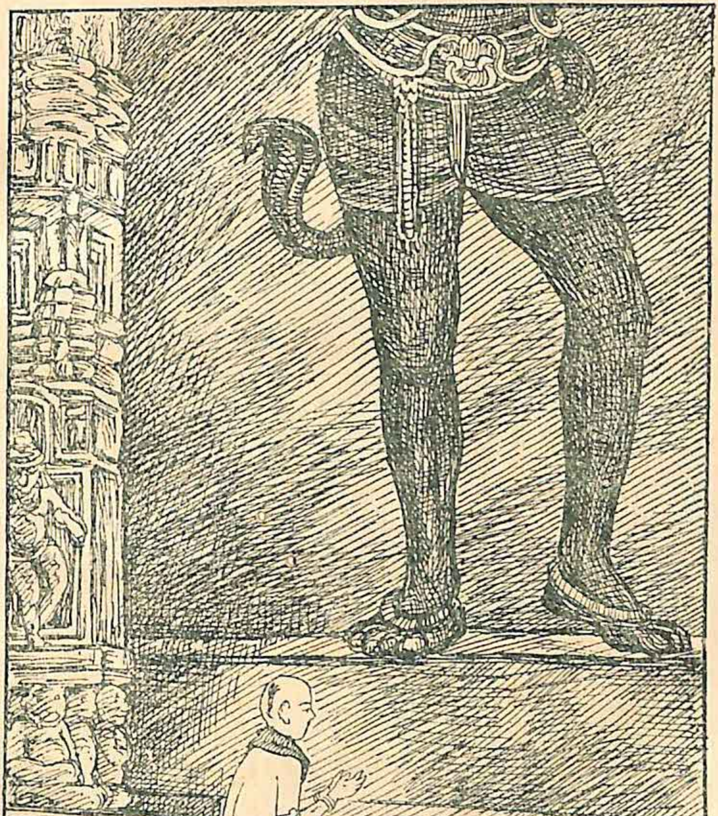
শ্রী ....

....

....

ইতি

তারিখ............ শ্রী



মহাবীর পূজা।

দক্ষিণা-পথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

সে আজ কতদিনের কথা—তারপর চার পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিককাল গিয়াছে, আর্য্যগণ যখন আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিতে লাগিলেন।

আর্য্য

তাঁহাদের বিদ্যা ছিল বুদ্ধি ছিল, দেশের পর দেশ জয় করিয়া নূতন নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহাদের সুন্দর বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ ছিল—দেহে শক্তি ছিল। তাঁহারা দেখিলেন কৃষ্ণবর্ণ অসভ্যগণ ফলে জলে পূর্ণ এই সোনার ভারত জুড়িয়া আছে! তাঁহারা সেই সকল অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিলেন, বীর যে, বসুন্ধরা

তার। সে যুদ্ধ কি দুই এক দিনের, না দুই এক বৎসরের? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গেল। শেষে যুগের পর যুগ অতীত হইল। আর্য্যে ও অনার্য্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। অনার্য্যগণ সে সকল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাননে কান্তারে লুকাইতে লাগিল—কতকবা আর্য্যদেরই দাসত্ব গ্রহণ করিল।

আর্য্যাবর্ত্ত

বিজয়ী আর্য্যগণ প্রথমে ভারতের সিন্ধুসেবিত জনপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, বর্ষার বারিপ্রবাহের মত ক্রমেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর্য্যশিক্ষা আর্য্যসভ্যতা আর্য্যধর্ম্মমত, আর্য্য আচার ব্যবহার, ক্রমে দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। একদিন যাঁহারা সিন্ধুসেবিত প্রদেশে আর্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে গঙ্গা এবং যমুনা বিধৌত জনপদে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তখন উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদয় উত্তরভারত আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যদের দেশ নামে পরিচিত হইয়া গেল।

ভারতের পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্ব মুখে ধাবিত বিশাল

বিন্ধ্য শৈলমালা শ্বাপদসঙ্কুল ও দুর্গম। বহু যোজন বিস্তৃত মহাকান্তার নিবিড় ও ভয়াল। সে কান্তারে যাহারা বাস করিত তাহারা আর্য্য আচার নীতি, আর্য্য সভ্যতা ও শিক্ষা গ্রহণ করিলনা। তাহারা আর্য্যদের কাছে বশ্যতাও মানিল না। তাহারা ভাবিল, পর চিরদিনই পর! পরের কাছে আপনাকে বিকাইব? আমার কাঞ্চন থালি না থাকে না থাকুক—কদলিপত্র ত আছে। আমি তাহাতেই ভোজন করিব—তবুও আর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে যাইব না! আর্য্যগণ রোষে ও ঘৃণায় কহিলেন—উহারা কি মানুষ? উহারা হিংস্র রাক্ষস, দুষ্ট অসুর—উহাদের মুখ দেখিলে পাপ হয়—ছায়া মাড়াইলে দেহ অশুচি হয়! আর্য্যেরা যাহাদের রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিলেন, তাহারা নীরবে বসিয়া থাকিবার লোক ছিল না। তাহারা সুবিধা পাইলেই আর্য্যঋষিদের আশ্রম লুণ্ঠিত, সতত যজ্ঞ পণ্ড করিত, গ্রাম ও নগরে নানা উৎপাত ঘটাইত। তাহাদের ভয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন আর্য্য বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করে নাই—সে মহাকান্তারে প্রবেশ করে নাই—দক্ষিণাপথের সহিত সম্বন্ধ রাখে নাই! দক্ষিণাপথ তখন অনার্য্যদিগেরই রাজ্য ছিল।

দক্ষিণাপথ

তাপস অগস্ত্য
ও
দণ্ডকারণ্য

সকল দেশেই দশ বিশ জন এমন লোক দেখা যায় যাহারা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেখানেই বিপদ অতি গুরু সেখানে যাইতেই তাহাদের আনন্দ। যেখানে গেলে দিনে শতবার প্রাণকে হাতের মুঠায় ধরিতে হয়, সেখানে যাইয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিলেই এই দুঃসাহসিক লোকগণ মনে করে জন্ম সফল হইল—জাতির মান বাড়িল। আর্য্যদের মধ্যেও তেমন লোকের অভাব ছিল না। তাপস অগস্ত্য একদিন তাঁহার শিষ্যদের ডাকিয়া কহিলেন—'আর্য্য আমরা—আমাদের ললাটে জয়ের টীকা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। চল্ ওই অপরিজ্ঞাত বিস্ময়কর বিপদপূর্ণ ভয়ানক দক্ষিণাপথের দিকে ধাবিত হই। বিন্ধ্যত অতি তুচ্ছ, হিমালয়ও আমাদের পথরোধ করিতে পারিবে না।' দুঃসাহসিক আর্য্য তপস্বিগণ তখন বীর-বিক্রমে বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিলেন—পরম সাহসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণাপথের রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইলেন। যুদ্ধে শেষে তাঁহাদেরই জয় হইল। তাপস অগস্ত্য তখন দক্ষিণাপথের সামান্য একটু অংশ আর্য্যদের বাসের যোগ্য করিয়া লইলেন। তাঁহাদের বিজয়-বার্ত্তা শুনিয়া অনেকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে

দক্ষিণাপথে আসিতে লাগিল। নিয়ত পুষ্পিত প্রচুর ফল-মূল সমন্বিত, নানা বিহঙ্গের কলকণ্ঠে মুখরিত গোদাবরী তটে—পদ্ম উৎপল ও মৎস্য পরিপূর্ণ পম্পা সরোবর তীরে-পীতবর্ণ কুসুমে সুশোভিত কর্ণিকার তরুকুঞ্জে, কোথাও বা শৈলপাদমূলে দিনে দিনে নানা আশ্রম স্থাপিত হইল। মহর্ষি শরভঙ্গ, পরম তাপস সুতীক্ষ্ণ, কোথাও ঋষি মাণ্ডকর্ণি কোথাও বা অগস্ত্য দণ্ডকারণ্যের সেই সকল পরম রমণীয় আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করিবার ছুইটী প্রধান দ্বার। একটী উত্তর-পশ্চিমে এবং আর একটী উত্তর-পূর্ব্বে।

দ্রবিড়

উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার বহু দিন পূর্ব্বে—কত পূর্ব্বে তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না—একটী সভ্য জাতি সেই উত্তর-পশ্চিম সিংহদ্বার দিয়াই প্রথমে পঞ্চনদে এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাপথে আগমন করিয়াছিল। ভারতের আর্য্য-অতিথিগণ হইতেও প্রাচীন এই অতিথিগণ সাধারণ ভাবে দ্রবিড় জাতি নামে পরিচিত। ভারতের সুদূর দক্ষিণদিকে অবস্থিত তামিল, তেলেগু, কেনারি, মালয়ালম্ প্রভৃতি জাতির ইহারাই পূর্ব্ব-পুরুষ।

কালক্রমে দক্ষিণাপথেও আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল বটে—কিন্তু সে বহু আয়াসে ও বহু কালে। দ্রবিড় জাতি বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়াছিল—আর্য্য-সভ্যতার সংঘর্ষে পড়িয়া আপনাকে হারায় নাই! ইহাই কি বলিয়া দেয় না যে প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতার মূল অতি দৃঢ় ছিল? দ্রবিড় জাতি যে বহুদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে প্রতিদ্বন্দীহীন হইয়া বিরাজ করিত—ইহাই কি বলিয়া দেয়না যে সে জাতির শক্তি অপরিমিত ছিল। পাষাণে গঠিত বৃহৎকায় সুদৃঢ় দুর্গে তাহারা বাস করিত, লৌহ-প্রাচীরে ঘিরিয়া তাহারা পুরী রক্ষা করিত। তাহাদের সেনা সাহসী ছিল—রণে হয় হস্তী ও রথ ব্যবহৃত হইত—সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহারা পাষাণ পর্য্যন্ত ভেদ করিত। উত্তালতরঙ্গমালাসমাকুল সমুদ্রে তাহাদের বৃহৎকায় অর্ণবপোত সকল এককালে অনায়াসে বিচরণ করিত। সে কালের বিমান যদি একালের 'এরোপ্লেন' হয় তবে তাহাদের তাহারও অভাব ছিলনা। তাহারা যাগ যজ্ঞ করিত না—আর্য্যদের দেব দেবী মানিত না—আর্য্য-রীতি-নীতি গ্রহণ করিত না—আর্য্যদের দাসত্বও স্বীকার করিত না, এই অপরাধে আর্য্যগণ তাহাদিগকে দস্যু

দ্রবিড় সভ্যতা

রাক্ষস, বানর, ভল্লূক প্রভৃতি কতই না বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

কেনা জানে যে এক সময়ে কাশল নামক আর্য্য-রাজ্যের প্রভায় আর্য্যাবর্ত্ত সমুজ্জ্বল ছিল। সে রাজ্যের শোভা ও সম্পদ তখন ভারতে অতুল ছিল। তখন তেজস্বী সরল স্বভাব ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ বীরগণে রাজধানী অযোধ্যা পরিপূর্ণ থাকিত। নাগরিকগণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন তাহারা কুণ্ডল, কিরীট ও মাল্য ধারণ করিয়া অঙ্গদ, নিষ্ক ও করাভরণে সজ্জিত হইয়া পরমানন্দে বিচরণ করিত। নারী তখন ধর্ম্মশীলা ও নরগণ নির্ম্মলস্বভাব, যজ্ঞ-দীক্ষিত এবং উচ্ছৃঙ্খলতাহীন ছিল। রাজপথ তখন নানা বর্ণের পতাকায় সুসজ্জিত হইত—তোরণে তোরণে বিচিত্র কুসুমমাল্য দুলিত—জলসিক্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথে সারি সারি হয় হস্তী ও রথ চলিত—গৃহে গৃহে ধ্বজদণ্ড শোভা পাইত—কক্ষে কক্ষে মধুর গীত বাদ্য ধ্বনিয়া উঠিত। এই কোশল রাজ্যের মুকুটমণি রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার দিনে বিমাতার কুটিলতায় নির্ব্বাসিত হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্তে কোশল

পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য রাজনগরী অযোধ্যা

পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিতে আসিতে ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে মাত্র দুই যোজন পথ দূরে অবস্থিত পঞ্চবটী নামক স্থানে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন একালের নাসিক সেকালের পঞ্চবটী। লঙ্কেশ্বর রাবণ পঞ্চবটী হইতে সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইলে পর শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্র ও অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। কত কানন প্রান্তর, নগ নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শেষে দক্ষিণাপথের কিষ্কিন্ধ্যা নামক অনার্য্য রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। সে কালের কিষ্কিন্ধ্যা, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গতঃ একালের হাম্পি এবং অনেগুন্দি শৈলমালা বলিয়া পরিচিত।

দক্ষিণাপথে কিষ্কিন্ধ্যা

আর্য্যগণ কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসিদিগকে বানর রূপে পরিচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা কাননবিহারী বানর ছিল না। রামচন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে সে দেশের লোকও বেদ পাঠ করিয়াছে, ব্যকরণ শাস্ত্র পড়িয়াছে। তাহাদের মূর্ত্তি সুন্দর, বচন নির্ভুল। রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যা-পতি সুগ্রীবের কর ধারণ করিয়া অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া মৈত্রী করিয়াছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসিগণ তখন সুচিত্রিত কারুকার্য্যময় স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকায় আরোহণ করিত—উত্তম বসন ও মাল্য চন্দনে ভূষিত থাকিত। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, অর্থতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ লোকের অভাব তখন কিষ্কিন্ধ্যায় ছিল না। নগরী গীত ও বাদ্যে মুখরিত থাকিত। সুরম্য প্রাসাদ ও হেমগৃহ প্রভৃতিতে কিষ্কিন্ধ্যার রাজভবন সুসজ্জিত ছিল। সে সকল প্রাসাদ হিমানীমণ্ডিত কৈলাসশিখরের ন্যায় শুভ্র—পুষ্পিত বৃক্ষলতায় পরিশোভিত—স্ফটিক শৈল সমূহে পরিবেষ্টিত থাকিত। তখন তপ্ত কাঞ্চনে খচিত প্রবেশ-তোরণ দিব্য মালায় ভূষিত রহিত—বলশালী শস্ত্রপাণি বীরগণ সেই তোরণে অপেক্ষা করিয়া রাজপুর রক্ষা করিত।

রাজার অন্তঃপুরে কক্ষের পর কক্ষ ছিল। প্রতি কক্ষে মহামূল্য আস্তরণ বিশিষ্ট নানা উত্তম আসন ও হেম-রজত-খচিত সুন্দর পালঙ্ক বিরাজ করিত। কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রামানুজ লক্ষ্মণ এ সকল দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কোথাও যন্ত্রী যন্ত্র লইয়া বাজাইতেছে, কোথাও গায়ক গায়িকা গাহিতেছে, কোথাও বা সুকুলোৎপন্না মাল্যধারিণী নারিগণ একমনে হার গাঁথিতেছে। সামান্য অনুচর পর্য্যন্ত সেখানে উত্তম বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

দক্ষিণাপথে, মধ্যভারতে ও সুদূর হিমালয়ের পার্ব্বত্য-জাতিগণের উপরও তখন কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবের অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কোথায় বিন্ধ্য, সুদর্শন সহ্য পর্ব্বতমালা—কোথায় রাজপুতানার পশ্চিমভাগে অবস্থিত পরিযাত্র পর্ব্বত—কোথায় কৈলাস আর কোথায় দক্ষিণ ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং হাজারিবাগের ভিতর দিয়া প্রসারিত মন্দার পর্ব্বত—সকল স্থান হইতেই সেনা আনিয়া সুগ্রীব রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দূত—কেহ মহেন্দ্র, হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিল—কেহ বা মন্দর ও পাণ্ডুশিখরে গেল—কোন দূত অস্তাচল, উদয়াচল ও পদ্মাচলে—কেহ বা অঞ্জনপর্ব্বত এবং ধূম্র শৈলে গমন করিয়া পর্ব্বতবাসী বীরবৃন্দকে কিষ্কিন্ধ্যাপতির আদেশ জানাইল। রামায়ণের এই বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে আর্য্যাবর্ত্তে যখন আর্য্য-কোশল একটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, তখন দক্ষিণাপথেও অনার্য্য-কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের বিক্রম, সম্পদ ও সভ্যতা কম ছিল না।

ভারতবর্ষ কোন দিনই কোন একজন নরপতির রাজ্য ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ছিল—সেই

উত্তর-ভারতে ভাঙ্গা-গড়া

সকল রাজ্যের নৃপতিগণ সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত

থাকিতেন। একের রাজ্য জয় করিয়া অপরে প্রবল হইতেন, আবার কালক্রমে তাঁহাকে জয় করিয়া অন্য কোন শক্তিশালী নরপতি বৃহত্তর রাজ্য সংস্থাপিত করিতেন। যুগের পর যুগ, এইরূপে যে কত ভাঙ্গা গড়া হইয়াছে তাহার কাহিনী এখন আর জানা যায় না। খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ বহুদিন পূর্ব্বে দেখিতে পাই উত্তর ভারতে কোশল সাম্রাজ্য। তাহা অতি বিরাট—অতি শক্তিশালী। কাশীরাজ্য তখন কোশলের পদানত। তাহার পর দেখিতে পাই বৃহৎ মগধ রাজ্যের সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা। শিশুনাগ রাজবংশ তখন সে সাম্রাজ্যের অধিপতি। এই কালের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অজাতশত্রু মহাবীর ছিলেন। তাঁহার বীরপদভরে সমস্ত উত্তরাপথ কাঁপিত। অত বড় যে কোশল রাজ্য তাহাও তাঁহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ এবং মহাবীর এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিছুই চিরদিন থাকে না। উচ্চ চূড় শৈলমালাও ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু হয়—উত্তাল তরঙ্গ মালায় শোভিত সাগর শুকাইয়া মরুভূমি হয়। এক যায়, আর আসে। যেমন কুরু গেল—পাঞ্চাল গেল—কাশী গেল—কোশল গেল—যেমন বিম্বিসার গেলেন,—অজাতশত্রু গেলেন,—তেমনি

নন্দ রাজবংশও ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল। মহাপদ্মনন্দের দুইলক্ষ পদাতি, বিংশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র রথ এবং চারি সহস্র রণহস্তীর কথাও কালক্রমে লোকে বিস্মৃত হইল। মেসিদনের মহাবীর আলেকজেণ্ডার কয়েক বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া উত্তর-ভারতের কত যুদ্ধ ক্ষেত্র শোণিতে সিক্ত করিলেন, কত রাজার মুকুট তাঁহার চরণতলে লুটাইল— শেষে তিনিও জলের বিন্দুর মত বিলুপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে উত্তর-ভারতে যে একটী বিশাল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম মৌর্য্য রাজ্য। উত্তর-ভারতের এই ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে সেকালে দক্ষিণাপথের কোন সম্বন্ধ ছিল না। দক্ষিণাপথ নিজের স্বাধীনতা ও শাসনতন্ত্র লইয়া নিজের শিক্ষা ও সভ্যতা লইয়া, নিজের সম্পদ ও সাহিত্য লইয়া বিরাজ করিতেছিল। উত্তর-ভারতের রাজগণ দক্ষিণাপথ জয় করিবার জন্য তখন কোন চেষ্টা করেন নাই।

সম্রাট অশোকের প্রস্তর স্তম্ভ

মৌর্য্য রাজবংশের ভুবনবিখ্যাত রাজপুরুষ সম্রাট অশোক দেশে দেশে, দিনে দিনে প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়া কত নীতি-বাক্য ঘোষণা করিলেন,দেশে দেশে দিকে দিকে দূত পাঠাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম

প্রচার করিলেন। তাঁহার একটী প্রস্তর স্তম্ভে যে লিপি খোদিত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে এই সময়ে দাক্ষিণাপথে চোল, পান্ড্য, কেরল এবং সত্যপুত্র নামে চারিটী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব্বভাগে পান্ড্য, পশ্চিমে কেরল এবং উহাদের উত্তরে কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তামিলকম্

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত এবং কৃষ্ণার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত, দক্ষিণাপথকে প্রধাণতঃ এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। উত্তর সরকারকে বাদ দিয়া আধুনিক মান্দ্রাজ বিভাগ, ভিজাগাপট্টম্ এবং গঞ্জাম জেলা, মহীশূর, কোচীন এবং ট্রাভাঙ্কোর রাজ্য লইয়া দক্ষিণাপথের যে অংশ গঠিত, এক সময়ে সাধারণ ভাবে তাহাই তামিলকম্ বা তামিল রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এই জনপদের অধিবাসিগণ তামিল ভাষা ব্যবহার করে বলিয়া রাজ্যের নাম তামিল রাজ্য হইয়াছে। গ্রীক ভৌগলিক টলেমি খৃষ্ট জন্মের ১৪০ বৎসর পর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তামিল রাজ্যকে 'দামিরিক' নামে পরিচিত করিয়াছেন।

তামিলকম্

কোন দেশের কাব্য নাটক প্রভৃতি সাহিত্য হইতে

আমরা সেই দেশের অনেক তত্ত্ব জানিতে পারি।

তামিল সাহিত্য

প্রাচীন কালে তামিল-রাজ্যে যে সাহিত্য জন্ম লাভ করিয়াছিল, কবিতা ছিল তাহার প্রধান অংশ। সেই সকল কবিতা হইতে তামিল রাজ্যের অনেক সামাজিক বিবরণ লাভ করিতে পারা যায়। জানিতে পারা যায় যে তখনো তামিল দেশের একটী নিজস্ব সভ্যতা ছিল। উত্তর-ভারতে প্রচলিত সভ্যতা রীতি-নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি তখনো তামিলদেশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। জাতিভেদ প্রথা তখন উত্তরভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তামিল রাজ্যে উহার স্থান ছিল না। উত্তর-ভারতের ক্রিয়া কর্ম্ম পদ্ধতি তখনো তামিল সমাজে স্থান পায় নাই।

তামিল রাজ্যের প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া দেয় যে সে কালে কাব্য ও কবিতা যথেষ্ট রূপে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং উন্নত হইয়াছিল। ললিতকলা সেকালে এত সমাদৃত হইত যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেকালে অর্থ যত সুখ ও বিলাস দিতে পারিত তামিল দেশের নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দে সে সমুদয় ভোগ করিত। নিরন্তর গৃহ-বিবাদ বর্ত্তমান থাকিলেও সে সুখ ও বিলাসীতার পথে কোন বাধা ঘটে

নাই। গীত বাদ্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সেকালে তামিল রাজ্যের প্রধান গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত। গৃহবিবাদ কালে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তামিলগণ যেরূপ নির্ম্মমতার পরিচয় দিত বলিয়া প্রাচীন তামিল সাহিত্যে বর্ণিত আছে, কেহ কেহ বলেন তাহা দেখিলে মনে হয়, সুখ ও শান্তি কাহাকে বলে তাহা সে দেশের লোক জানিত না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে। কবিতা যেখানে কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিত, মধুর গীত যেখানে গগন পবন মুখরিত করিত, নয়ন-মনোহর চিত্র যে দেশে প্রকৃতিকে পটে ফুটাইয়া তুলিত, যে দেশের লোক প্রস্তরে বা কাষ্ঠে বা মৃত্তিকায় কোমল সুন্দর ও জীবন্তবৎ মূর্ত্তি রচনা করিত—সে দেশের লোক সুখ সম্ভোগ জানিত না ইহা বলা যায় না।

তামিলে গৃহ বিবাদ

সেকালে পাল্ড্য, চোল এবং কেরল রাজ্যই তামিল দেশের তিনটী প্রধান রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু আমরা জানিতে পাই যে তখনো শতাধিক স্বাধীন ও ‘ রাক্রান্ত সামন্ত-রাজ তামিল-রাজ্যে বাস করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ কাটিয়া বড় হইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তামিল ভূমি তাই সর্ব্বদা যুদ্ধ-কলহে ব্যস্ত

থাকিত—যোধগণের শোণিতে সিক্ত রহিত। আজিও বহু পরিত্যক্ত জনশূন্য বনাকীর্ণ দুর্গ প্রাচীন কালের সেই গৃহ-বিবাদের পরিচয় দেয়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে পুরাকালে তামিল-রাজ্যে দৈত্যের উপাসনা হইত। উহাই ছিল সাধারণ ধর্ম্মমত।

তামিলে ধর্ম্মমত

উত্তর ভারতে যে জৈন ধর্ম্ম জন্মলাভ করিয়া নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা সুদূর তামিল রাজ্যে পর্য্যন্ত অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট অশোক পৃথিবীর নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্র দক্ষিণাপথে বৌদ্ধধর্ম্মের যে তরঙ্গ আনিয়াছিলেন তাহা তামিলরাজ্যে তেমন পূজা লাভ করে নাই। যে তামিল রাজ্যে একদিন জাতিভেদ প্রথা আদৌ স্থান পায় নাই—কালের কি বিচিত্র লীলা, এখন সেই দেশেরই লোক জাতিভেদের শৃঙ্খলে এমন দৃঢ়রূপে বাঁধা পড়িয়াছে যে উত্তর-ভারতের লোকও তেমন পড়ে নাই! আপনার চরণশৃঙ্খল রচনা করিতে শিষ্য এখানে গুরুকেও পরাজিত করিয়াছে।

মুক্তা, লঙ্কা ও বেরিল (Beryls) তামিল দেশের প্রধান

সম্পদ। সেই সম্পদের লোভে বহু প্রাচীনকালে রোমকগণ তামিল দেশে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং বাণিজ্য করিতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিত। এই কারণেই রোমের স্বর্ণ মুদ্রা এক সময়ে তামিল দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। সেকালে য়ুরোপীয় সেনাগণ বর্ম্মে চর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া তামিল রাজন্যগণের দেহরক্ষীর কার্য্য করিত—য়ুরোপীয় সুগঠিত অর্ণবপোত সমূহ তামিল-রাজ্যের বন্দরে বন্দরে সারি সারি অপেক্ষা করিত এবং মুক্তা প্রভৃতি লইয়া নাচিতে নাচিতে দুলিতে দুলিতে দূর দূরান্তরে প্রস্থান করিত। রাগিয়া যাইত শুধু যাবনিক সুরা ও নানা ধাতুতে গঠিত নানাবিধ পাত্র এবং দীপাধার।

তামিলে বৈদেশিক বাণিজ্য

বর্ত্তমান তিনেভেলি জেলায় ক্ষুদ্র একটী নদী আছে তাহার নাম তাম্রপর্ণী। তাম্রপর্ণীর তীরে এখনো একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে সে গ্রামের নাম কর্কাই। এমন দিন ছিল যখন তামিলকমের সকল গৌরব কর্কাইকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কর্কাই তখন ছিল পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী—উহাই ছিল তামিলকমের প্রধান বন্দর। লক্ষ লক্ষ মুদ্রার মুক্তা তখন এই কর্কাই নগরে বিক্রীত

পাণ্ড রাজ্য

হইত। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ মদুরায় নব রাজধানী গঠিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বাণিজ্যলব্ধ অর্থের আশায় পাণ্ড্য-যুবরাজ তখনো কর্কাইতেই থাকিতেন। কালক্রমে মদুরাই পাণ্ড্য কবিদিগের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল।

বালুর চরে জলপথ রুদ্ধ হওয়ায় যখন কর্কাই বন্দরে অর্ণবপোত আসিতে পারিত না, তখন তাম্রপর্ণীর মুখ হইতে তিন মাইল অন্তরে কায়ল নামক নূতন পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কায়লই ছিল দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর।

এক সময়ে চোল রাজ্যের সহিত ও সিংহলের সহিত পাণ্ড্য রাজ্যের নিরন্তর যুদ্ধ হইত। শেষে এমন সময় আসিয়াছিল যে পাণ্ড্যরাজ্য বহুদিনের জন্য চোলরাজের পদানত ছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে রাজ্যের বিজয় দুন্দুভি সাগরতরঙ্গবিধৌত সিংহলের দ্বারদেশে ধ্বনিত হইয়াছিল—যে রাজ্য হইতে মুক্তা আহরণ করিবার জন্য গ্রীক ও রোমক বণিকগণ প্রাণপাত করিতেন, যে দেশ একদিন নারীর শাসনে সমুন্নত হইয়াছিল, যে দেশের ৫ শত রণহস্তী, ৪ সহস্র অশ্বারোহী

এবং একলক্ষ ত্রিংশ সহস্র পদাতিক রণজয়ে গৌরব লাভ করিয়া পাণ্ডারাণীর বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল, সে দেশের কাহিনী এখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয় সিংহ সিংহলের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া একদিন মহাসমারোহে এক পাণ্ড্যরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া রাজকুমারী সিংহলে গিয়াছিলেন, তাহা এতই বৃহৎ ছিল যে ১৮ জন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ৭৫ জন দাস দাসী, ৭০০ সখী ও অন্যান্য লোকজন অনায়াসে তাহাতে স্থান পাইয়াছিল।

পেরিয়ার নদীর তীরে এখন একটা পরিত্যক্ত গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সে গ্রামের নাম তীরু-কারুর্।

কেরল রাজ্য বা মালাবার

এক সময়ে এই স্থানই ছিল অধুনা বিস্মৃত কেরল রাজ্যের রাজধানী। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ কেরল বা বর্ত্তমান ত্রাভাঙ্কোর পরাক্রান্ত চোল রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। পাণ্ড্যরাজের পতাকায় রাজচিহ্ন স্বরূপ যেমন কুঠার ও হস্তী অঙ্কিত থাকিত, কেরলরাজেরও চিহ্ন ছিল তেমনি ধনুক। সেকালে চেরা রাজ্য পাঁচটী খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তাহার প্রত্যেক খণ্ডকে বলিত "নাস্তু"।

একালে আমরা যে বন্দরকে বলি ক্রাঙ্গানোর, প্রাচীন-কালে তাহাই ছিল কেরল রাজ্যের প্রধান বন্দর মুজিরিস্। তখন সমুদ্র পথে আরব হইতে মুজিরিসে আসিতে ৪০ দিন লাগিত।

তামিলকমের তৃতীয় প্রধান অংশ চোল রাজ্য। এক দিন বহু ক্ষেত্র চোল বীরদিগের রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল, বহু জনপদ চোলকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য একদিন চোল রাজ্যের উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। চোলের বীর সেনানী একদিন বঙ্গদেশে পর্য্যন্ত আগমন করিয়া বঙ্গবীরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। চোল রাজসিংহাসনের ছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া এক দিন গ্রাম্য-শাসননীতি এরূপ উন্নত হইয়াছিল যে আজিও তাহার বিবরণ বিস্ময় উৎপাদন করে।

চোল রাজ্য

একদিন যে চোল রাজ্য পূর্ব্বদিকে কেবল মান্দ্রাজ ও আর কয়েকটি জেলা লইয়া গঠিত হইয়াছিল—খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে সেই রাজ্যের অধীশ্বর রাজরাজদেব বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিয়া দক্ষিণাপথের প্রায় একচ্ছত্র সম্রাটরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। সমুদয় মান্দ্রাজ বিভাগ, সিংহল এবং

চোল রাজ্যের বিস্তার

মহীশূর দেশের অধিকাংশ চোল রাজ্যরূপে পরিচিত হইয়া রাজরাজদেবের অমিত বিক্রম ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহার অগণিত রণতরী একদিন জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ভারত সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে উল্লাসে নৃত্য করিত; সুদূর লাক্ষাদ্বীপ এবং মালদ্বীপ পর্য্যন্ত একদিন তাঁহার চরণলগ্ন হইয়াছিল। চোলরাজধানী তাঞ্জোরের নয়ন মনোহর মন্দিরগাত্রে আজিও সম্রাট রাজরাজদেবের বিজয়অভিযান কাহিনী নানা চিত্রে ফুটিয়া রহিয়াছে।

চোলরাজ্যে বাণিজ্য

চোল মণ্ডল বা করোমণ্ডল তটে সেকালে নানা সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। সেই সকল বন্দরে নানা দেশের বণিকগণ আসিয়া বাণিজ্য করিত। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের শিল্প সম্ভার চোল রাজ্যের বিপনীতে দিনের পর দিন বিক্রীত হইত—সুদূর মিশরের দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত চোল রাজ্যে আসিত। চোল রাজের অর্ণবযানগুলি শুধু চোলমণ্ডলের তীরে তীরেই ভ্রমণ করিত না—উহারা বঙ্গোপসাগর অনায়াসে অতিক্রম করিত—গঙ্গা ইরাবতীর মোহানায় আসিত—ভারতসাগরবক্ষে মালয় উপদ্বীপগুলির বন্দরে বন্দরে গমন করিত। কাবেরী নদীর মুখে যে প্রধান চোল বন্দর ছিল তাহার নাম কাবেরী পদ্দীনম্। হায়রে দুরন্ত কাল! একদিন কাবেরী

পদ্দীনম্ বিপুলকায় সুশোভন রাজপ্রাসাদ সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। যাহার পথে পথে বৈদেশিক বণিকদিগের গৃহগুলি নানা পণ্যে পূর্ণ থাকিত, আজ তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নাই। কাবেরীপদ্দীনম্ এখন বহু উচ্চ বালুকাস্তূপের নীচে স্থান লাভ করিয়াছে।

চোল ও পল্লবে কলহ

কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীদ্বারা বিধৌত জনপদে এক সময়ে একটী বীর জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। সে জাতি পল্লব জাতি নামে পরিচিত। পল্লবগণ তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গাদি হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগগুলি জয় করিতে লাগিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের সহিত চোল রাজের কলহ আরম্ভ হইল। খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে পল্লবগণ আধুনিক কঞ্জেভরমে যে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিল তাহা কাঞ্চী নামে পরিচিত। পল্লবদিগের সহিত কলহের ফলে চোলরাজ্য ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। ক্রমে উহার পরিধি মাত্রা ৪।৫ শত মাইলে আসিয়া দাঁড়াইল—উহার রাজধানী ক্ষুদ্র একটী নগরে মাত্র পর্য্যবসিত হইল। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক ওয়ান্ চোয়াং আসিয়া দেখিলেন হৃতগৌরব চোলরাজ্য বনাকীর্ণ হইয়াছে—সেই কানন

মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা হিংস্র পশুর ন্যায় ভীষণ এবং দ্বিধাহীন লুণ্ঠনকারী। দেশের বৌদ্ধ মন্দির-গুলি তখন জীর্ণ—কতক বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জৈন ধর্ম্ম তখন চোলদেশে বিস্তৃত হইয়াছে, জৈন সন্ন্যাসিগণ তখন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—চোলরাজ্য তখন পরাক্রমশালী পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মণের চরণলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

চোলের উত্থান

দিন কাহারও সমান যায়না, উত্থান ও পতন জগতের নিয়ম। আজ যে জাতি দীনতা ও হীনতার চরমে আসিয়াছে তাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। একদিন না একদিন সে জাতি উঠিবেই। ইহা বিধাতার বাণী। চোল রাজ্যও তাই উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাঞ্চীর পল্লব দিগের সহিত দক্ষিণ ভারতের চালুক্যদিগের যে ঘোর রণ বাধিয়া গেল তাহারই ফলে পল্লব-শক্তি প্রাণ হারাইল। পল্লবেরাই ছিল চোলের নিকট-শত্রু। শত্রু হীনবল হইবামাত্র চোলগণ দৃঢ়পণে উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। চোলরাজ বিজয়ালয় এক শুভমুহূর্ত্তে যে পথ অবলম্বন করিলেন, সেই পথে অগ্রসর হইয়া চোল জাতি ক্রমেই জয় লাভ করিতে লাগিল এবং অল্পকাল মধ্যেই পল্লব দিগের প্রতিষ্ঠার মন্দির চূর্ণ করিল।



বিজয়ী বীর উত্তর রাঢ় প্রদেশের অধিপতি মহীপালকে জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দক্ষিণাপথ পৃ—২৭।

সম্রাট রাজ রাজ চোল

এই সময়ে চোলরাজ্যে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহ বিবাদই সকল অনর্থের মূল। ব্যক্তিগত ভাবে উহা যেমন একটী সুখের সংসারকে ধ্বংস করে, তেমনি বিস্তৃত ভাবে উহা একটী শক্তিশালী ও সম্পদ সম্পন্ন জাতিকেও ধ্বংস করে। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে চোলরাজ রাজরাজ ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেশের গৃহ কলহ দূর করিলেন। বিজয় লক্ষ্মীর জয়মাল্য তখন রাজরাজদেবের কণ্ঠে অর্পিত হইল। মাত্র ২৭ বৎসরের রাজত্বকাল মধ্যেই চোল-রাজ সমগ্র দক্ষিণাপথের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। মান্দ্রাজ বিভাগ, সিংহল এবং মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ স্থান তাঁহার করায়ত্ত হইল। সম্রাট যে শুধু রাজ্য বিস্তারই করিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যের শাসন-নীতিও সুব্যবস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে যে সকল মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সমুদয় চোলরাজ্যের উন্নত স্থাপত্যেরই পরিচয় দিয়া থাকে। মন উদার না হইলে কোনদিকেই জয় লাভ করা যায় না। মন যাহার ক্ষুদ্র সে শুধু ক্ষুদ্রতাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। সম্রাট রাজ রাজ উদার চেতা ছিলেন। তিনি নিজে যদিও শিবের

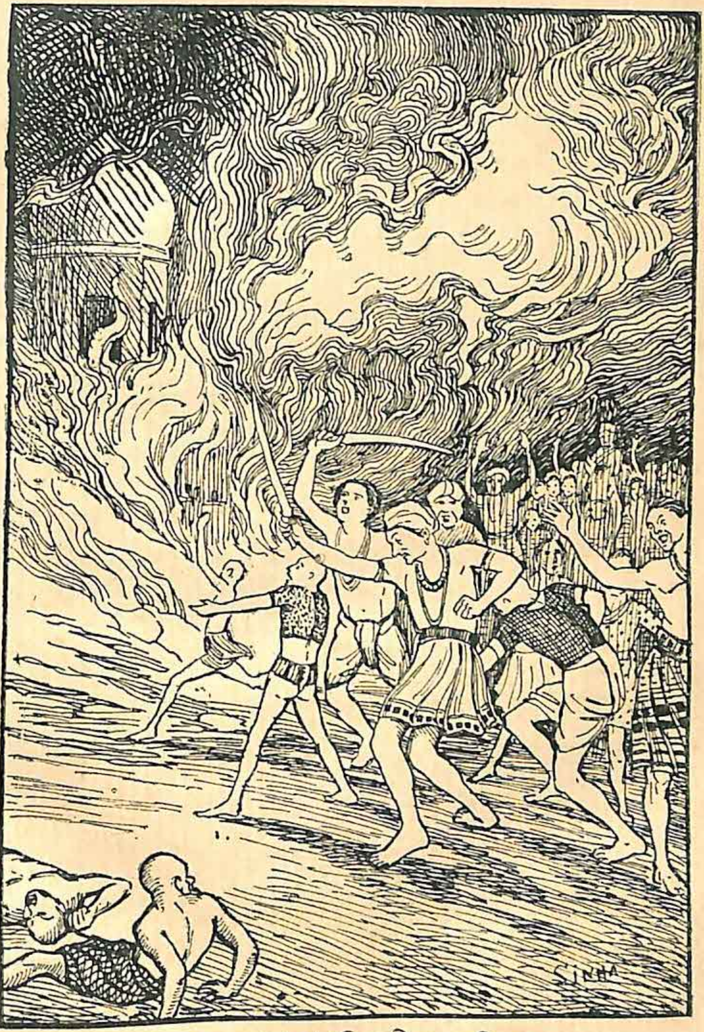
পূজা করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ প্রজাদিগের বৌদ্ধ মন্দিরে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সম্রাট রাজেন্দ্র চোল

রাজরাজ দেবের পুত্র রাজেন্দ্র চোল দেব যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, একাদশ শতাব্দীর সেই উষায় চোলরাজ্যের গৌরব বিভব ভারতবিস্তৃত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল পিতার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়াই রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। পিতা অপেক্ষাও তাঁহার শক্তি অধিক ছিল। তাঁহার নৌসেনার সিংহনাদে বঙ্গোপসাগরের বারিরাশি বিকম্পিত হইয়া উঠিল—পেগুরাজ্যের রাজধানী কিদারম্ এবং তক্কোলম্ ও মার্ত্তাবান নামক প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দুইটী তাঁহার করতলগত হইল। সেই জয়ের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য রাজেন্দ্র চোলদেব পেগুনগরে দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

গঙ্গৈকণ্ডা

রাজমুকুট গ্রহণের কিছুকাল পরই সম্রাটের সহিত কাণ্যকুব্জপতি মহিপালের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। সুদূর চোলরাজ্য হইতে বিপুলবাহিনী লইয়া সম্রাট রাজেন্দ্র চোল কত নদ নদী, কানন কান্তার অতিক্রম করিয়া হেলায় ভাগীরথী তীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সেকালের গমনাগমনের



অনল সংযোগে গৃহাদি ভস্মীভূত করিল।

দক্ষিণাপথ পৃ—২৭।

অসুবিধার কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সম্রাটকে কত না আয়াসে এই যুদ্ধাভিযান করিতে হইয়াছিল।

১০২২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজেন্দ্র চোল দেব প্রবল যুদ্ধে দুর্গম উড়িষ্যা জনপদ পদানত করিলেন। মনোরম "কোশলনাড়ু" বা সম্বলপুর প্রভৃতি উড়িষ্যার পশ্চিম প্রদেশ ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া তিনি এক ভীষণ যুদ্ধে দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপাল নামক একজন নরপতিকে ধ্বংশ করিলেন এবং অবলীলাক্রমে দক্ষিণ-রাঢ় জনপদ জয় করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের বা হরিকেলের অধিপতি গোবিন্দ-চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন। রাজেন্দ্র চোল দেবের সহিত অস্ত্র পরীক্ষায় গোবিন্দের পরাজয় ঘটিল। বিজয়ী বীর উত্তর রাঢ় প্রদেশের অধিপতি মহীপালকে জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই বিজয়-ব্যাপারকে স্মরণে রাখিবার জন্য সম্রাট গঙ্গৈকণ্ডা বা গঙ্গাবিজয়ী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হর্ষে ও গর্ব্বে একটী নবীন রাজধানী রচনা করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন গঙ্গৈকণ্ডা-চোলপুরম্, নগরীর প্রান্তভাগে যে বিরাট দেবায়তন স্থাপিত হইয়া সেকালের

চোল স্থাপত্যের কীর্ত্তিধ্বজ রূপে পরিচিত ছিল, তাহারই গর্ভগৃহে একখণ্ড কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত বিংশ হস্ত দীর্ঘ একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়ত সম্রাটের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেন। দেখিতে দেখিতে সুরম্য সুবৃহৎ প্রাসাদ ও প্রাকার সুরক্ষিত, কুঞ্জে ও সরোবরে সুশোভিত বৃহৎ রাজনগরী হাসিয়া উঠিল। নগরোপান্তে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খণিত হইল তাহার বেষ্টন-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল আট ক্রোশ!

চোল সাম্রাজ্য এখন কবিকল্পনার সামগ্রী হইয়াছে। তাহার কাহিনী এখন আর সহজে সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার গৌরব বিভবের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের নিদর্শনও অন্তর্হিত হইয়াছে। একদিন যে সকল প্রাসাদ প্রভাত কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া নয়ন মন হরণ করিত, আজ তাহাদের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ রাশির কিয়দংশ ত্রিচিন-পল্লীর কোন এক জনমানবহীন প্রদেশের কাননচ্ছায়ায় লতা গুল্মে আচ্ছাদিত থাকিয়া কালের অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চোল সাম্রাজ্যের শেষ নরপতি কুলত্তুঙ্গ। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। তাঁহার

চোল সাম্রাজ্যের পতন

পরই রাজমুকুট পাইবার জন্য চোলরাজ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কলহের অনলে চোল সাম্রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। এই সময়ে কিছু দিনের জন্য দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য একবার শির তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া খসিয়া ধ্বসিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতি কাহাকেও ক্ষমা করে না। তুমি যদি তাহার নিয়ম না মান তবে তোমাকে তাহার ফল ভুগিতেই হইবে। তুমি যদি আঘাত কর, তোমাকেও আঘাত সহিতে হইবে ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতির নিয়ম যে মানে না, কখন বা সে নিজে তাহার ফলভোগ করে, কখনো বা ভোগ করে তাহার বংশ। মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র যেদিন প্রভুহত্যা করিয়া নিজেই রাজ-সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেদিন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্গেই রাজবংশের পতনও সেইরূপেই ঘটিবে? কিন্তু কালে তাহাই হইয়াছিল। সুঙ্গরাজ দেবভুতির মন্ত্রী বাসুদেব তাঁহাকে হত্যা করিয়া যে রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম কান্ববংশ। কান্ববংশকেও কিছুকাল পর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

খৃষ্ট জন্মের ২৭ বৎসর পূর্ব্বে কোন অন্ধ্র নরপতি কান্বরাজ সুসর্ম্মাকে নিহত করিয়াছিলেন।

কান্বরাজবংশ বিলুপ্ত হইবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণাপথে অন্ধ্রীয়ান রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ-শতাব্দীতেই গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অনন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুদৃঢ় প্রাচীরে রক্ষিত ত্রিশটী রাজনগরী বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম তখন অন্ধ্র রাজ্যের শোভার ও সম্পদের ভাণ্ডার ছিল। সে রাজ্যের শক্তি তখন এত প্রবল ছিল যে শুধু আর্য্যাবর্ত্তের প্রবলপরাক্রান্ত মৌর্য্যরাজ্যই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিত। একলক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং সহস্র রণহস্তী যখন কৃষ্ণাতীরে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইত, রাজধানী শ্রীকাকুলমের সিংহদ্বারে যখন ঘোরনাদে তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিত তখন পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের নৃপতিবর্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন।

শ্রীকাকুলম্

মৌর্য্যরাজ্যের অখণ্ড প্রতাপ ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্ধ্রগণও শেষে মানিয়া লইল যে মগধরাজই ভারতের রাজ-চক্রবর্ত্তী ভারতের নৃপতি গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু এই পর্য্যন্তই তাহারা

সম্রাট অশোকের মৃত্যুতে
স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন

স্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের স্বাধীনতা হারায় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল। সেই সময়ে যখন মৌর্য্য সম্রাট অশোকের মৃত্যু হইল তখন সেই সুযোগে নানাদিকে স্বাধীন রাজ্য সমূহ গঠিত হইতে লাগিল। বাধা দিবার ক্ষমতা তখন অশোকের বংশধর দিগের ছিল না। অন্ধ্র নরপতি সিমুকও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও এই সময়ে সকল অংশে স্বাধীন পরম শক্তিশালী একটী সাম্রাজ্য গঠন করিলেন। বিজয় লক্ষ্মী তাঁহার অনুকূল হইয়াছিলেন। লিকুক যে দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন সেইদিকেই তাঁহার জয় ঘোষিত হইল। কিঞ্চিৎ অধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই অন্ধ্র রাজশক্তি এত প্রবল হইল যে সুদূর উড়িষ্যা দেশের রাজা খারবেল পর্য্যন্ত অন্ধ্র রাজের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল। মৌর্য্য-রাজবংশ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। শেষে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭ সালে অন্ধ্র রাজ কাম্বনরপতিকে বধ করিয়া ভারতে প্রধান হইলেন। অন্ধ্র রাজগণ শাতবাহন রাজবংশ নামে পরিচিত ছিলেন এবং অনেকেই শাতকর্ণী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই যুগে ভারতের সর্ব্বত্র সংস্কৃতের সেরূপ সমাদর

হয় নাই। অন্ধ্ররাজ হাল স্বয়ং কবি ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া সে সময়ে দক্ষিণাপথে একটি বিরাট প্রাকৃতিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। হালের মন্ত্রিগণ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৃহৎ কথা নামক সুপ্রসিদ্ধ গল্প পুস্তকও নৃপতি হালের কোন মন্ত্রীর রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নৃপতি স্বয়ং সপ্ত শতক নামক কবিতা পুস্তকের রচয়িতা।

নৃপতি হাল

এই সময়ে কাথিবাড়ে শোক, কাঞ্চীতে পল্লব এবং পশ্চিম-ভারতে যবনগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। অন্ধ্রগণের বিক্রম তখন অসীম—উত্তর-ভারতের পূর্ব্বদিকে জনপদের পর জনপদে তখন তাহাদের বিজয়পতাকা প্রোথিত হইতেছে। তাহারা তখন মগধ বিজয়ী। সুতরাং তাহাদের সহিত অচিরেই শক, পল্লব ও যবনদিগের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ধ্ররাজদিগের প্রবল পরাক্রমের সম্মুখে এই তিনটী বৈদেশিক জাতির শক্তি অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া গেল। খৃষ্ট জন্মের পর দুই শত বর্ষ মধ্যেই অন্ধ্ররাজ যজ্ঞ শ্রী কি জলে, কি স্থলে এতই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন যে সমগ্র ভারত চমকিত হইয়া

অন্ধ্রের পতন

উঠিল। শক্তি চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকে না—অন্ত্র শক্তিও ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল! দিনে দিনে সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মালব, কঙ্কন প্রভৃতি অন্ধ্রাজদিগের করচ্যুত হইল। দিনে দিনে অন্ধ্রের প্রতিষ্ঠামন্দির চূর্ণ হইয়া গেল। যে জাতি কিঞ্চিৎ অধিক ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, কেন যে তাহা বিলুপ্ত হইল সে কাহিনী এখনো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্ধ্রদিগের সে বীরত্বের ইতিহাস নাই। আছে কেবল কতকগুলি ভগ্ন জীর্ণ বৌদ্ধ মন্দিরাদির চিহ্ন। অন্ধ্র সম্পদের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাহাই এখন দক্ষিণাপথের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট

প্রবল পরাক্রমশালী অন্ধ্র রাজবংশের পতনের প.। তিন শত বৎসর চলিয়া গেল। এই কালের সঙ্গে দক্ষিণাপথে কোন্ ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইল, কোন্টী বা লুপ্ত হইয়া গেল কেহ তাহা বলিতে পারে না। এই যুগের দক্ষিণাপথের কাহিনী এখনো অজ্ঞাতই আছে। খৃষ্ট জন্মের পর ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্য ভাগে দেখিতে পাই বাতাপিপুরে একটী বৃহৎ রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। সেই রাজধানীতে মহারাজ জয় সিংহের প্রথম পৌত্র মহারাজ পুলকেশী মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন। বাদামী নামক স্থান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত। সেকালের বাতাপিপুর একালের বাদামী নামে পরিচিত। সেকালে মহারাষ্ট্র দেশে যাঁহারা রাজত্ব করিতেন তাঁহারা রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর

বাতাপিপুর

নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া যিনি বাতাপিপুরে চালুক্য রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম জয় সিংহ।

প্রথম পুলকেশীর রাজ্য ক্ষুদ্র ছিল। তাঁহার দুইটী বিক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব এবং দশ্চিম ভাগে চালুক্য রাজ্য অঙ্গবিস্তার করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চালুক্যরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

চালুক্যরাজ্যের বিজয় লাভ

৬০৮ খৃষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন চালুক্য রাজ্যে বীর সেনার অভাব ছিল না, অকুতোভয় সেনাপতিরও অভাব ছিল না। নব নব রাজ্য জয় করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হইবার আশায় দ্বিতীয় পুলকেশী বিশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত রহিলেন। উত্তরে এবং পশ্চিমে ‘লাট’ বা দক্ষিণ গুজরাট, গুর্জ্জর বা উত্তর গুজরাট এবং রাজপুতানা, মালব ও কঙ্কন প্রদেশ তাঁহার আক্রমণে পরাজিত হইল —পূর্ব্ব দিকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী তীর তাঁহার বীরপদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। পুলকেশী ঘোষণা করিলেন যে তিনিই দক্ষিণাপথের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

হর্ষবর্দ্ধন
ও
দ্বিতীয় পুলকেশী

এই সময়ে উত্তরভারতে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নাম হর্ষবর্দ্ধন। তাঁহার পাঁচ হাজার রণহস্তি ছিল, বিশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। তাঁহার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক যখন বর্ম্মে বর্ম্মে শোভিত হইয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিত, তখন সমগ্র উত্তরাপথ কম্পিত হইয়া উঠিত। এই বিপুল বাহিনী লইয়া হর্ষ উল্কার বেগে উত্তরভারতের রাজন্য সমাজকে আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এরূপভাবে যুদ্ধে লিপ্ত রহিলেন যে এক দিনের জন্যও হস্তির পৃষ্ঠ হইতে হাওদা নামিল না—সিপাহীর শিরস্ত্রাণ খসিল না! হর্ষবর্দ্ধন উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। তিনি দেখিলেন তখন দ্বিতীয় পুলকেশী দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র সম্রাট। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না! তখন তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইয়াছে—তখন তাঁহার জয়গানে উত্তর ভারত মুখরিত। তখন তাঁহার পাঁচ হাজার রণহস্তী যাইট হাজার হইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক একলক্ষ হইয়াছে! তিনি ভাবিলেন, দক্ষিণাপথ জয় করিতেই হইবে—সম্রাট পুলকেশীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে।

হর্ষবর্দ্ধন বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। পুলকেশীও তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ অনুমান হয় যে উড়িষ্যায়, কলিঙ্গে ও দক্ষিণ কোশলে হর্ষের সহিত পুলকেশীর ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই সকল যুদ্ধে পরাজয় মাত্র লাভ করিয়া উত্তরভারতের অধীশ্বর ক্ষুণ্ণ-মনে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন হর্ষ ও পুলকেশী উভয়ের রাজ্যের মধ্যে নর্ম্মদা নদীই সীমা-চিহ্ন স্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল।

বিজয়ী বীর পুলকেশীর হৃদয় নবরাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া উঠিল। তখনো দক্ষিণ ভারতে চোল, পাণ্ড্য, কেরল এবং পল্লব নামক স্বাধীন রাজ্যগুলি বর্ত্তমান ছিল। পুলকেশীর সহিত এই সকল রাজ্যের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নানা যুদ্ধে তাঁহারই জয় ঘটিতে লাগিল। দিনে দিনে দক্ষিণাপথেশ্বরের পরাক্রম ও গৌরবের কথা শুধু ভারতে নহে, ভারতের বাহিরে সুদূর পারশ্যদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পুলকেশীর দূত যখন পারস্যরাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন তখন সম্রাট দ্বিতীয় খস্রু তাঁহাকে বহু মানে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার দূতও ভারতে আসিয়া পুলকেশীর সভায় সমাদৃত হইলেন। অজন্তার গুহায়

পারস্য রাজ দ্বিতীয় খস্রু

প্রাচীনকালে লিখিত যে সকল সুন্দর চিত্রাবলী বর্ত্তমান আছে তাহারই একখানি চিত্র পারসিক দূতের সম্বর্দ্ধনার পরিচয় দিতেছে।

পল্লব ও চালুক্য

কালের চক্রে দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতিষ্ঠার মন্দিরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে চালুক্য সাম্রাজ্যও অপেক্ষাকৃত হীন বল হইল। তখন পূর্ব্বকথিত কাঞ্চীর পল্লবদিগের সহিত চালুক্যদিগের যে সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহাতে পল্লবগণ জয় লাভ করিতে লাগিল। পুলকেশী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না। শেষে একদিন পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মণ পুলকেশীর রাজনগরী অধিকার করিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিলেন। চালুক্যের গৌরসূর্য্য কিছুদিনের জন্য মেঘের অন্তরালে লুকাইল। দক্ষিণাপথের সুদূর দক্ষিণাংশ তখন পল্লবদিগের জয়গানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী চালুক্যরাজদিগের কাহিনী বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধারের চেষ্টার কাহিনী—তাহা চালুক্য ও পল্লবে যুদ্ধ-বিগ্রহের শোণিতলিপ্ত ইতিহাস।

রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিস্মৃতপ্রায় রাষ্ট্রকূটবংশের একজন বীরপুরুষ দন্তিদুর্গ বাহুবলের প্রভাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করিলেন। লোকে যাঁহাকে জানিত না, চিনিত না—তিনিই শেষে সকলের নিকট সুপরিচিত হইলেন। লোকে যাঁহাকে হয়ত মানিত না, বাহুবল তাঁহাকে সকলের পূজার্হ করিল। চালুক্যগণ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া গেল। চালুক্যের শক্তি ও গৌরব, যাহা তখন প্রতিদিন হীনপ্রভ হইতেছিল, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। সেই অন্ধকারকে পুনরায় আলোকিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিল রাষ্ট্রকূটদিগের গৌরব ও বিভব—রাষ্ট্রকূট-দিগের মান ও মর্য্যাদা, রাষ্ট্রকূটদিগের শক্তি ও সাধনা। তেমন সাধনা থাকিলে একজনেই যে লক্ষাধিক হইতে পারে, একটা সমগ্র জাতিকে গভীর অন্ধকার হইতে তীব্র আলোকে আনিতে পারে, রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ তাহারই উদাহরণ। চালুক্য রাজধানী বাতাপি জয় করিয়া দন্তিদুর্গ চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার ব্যবহারে তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি হারাইলেন এবং পরিশেষে তাঁহার খুল্লতাত প্রথম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন! তিনি যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহা পূর্ণ হইল। রাষ্ট্রকূট রাজ কৃষ্ণ অচিরে চালুক্য সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়া দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূটশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কৃষ্ণ যে কেবল রাজ্যজয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাহা নহে। ললিত শিল্পকলার উন্নতি বিধানেও তাঁহার যত্নের ত্রুটী ছিল না। হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যে অবস্থিত ভুবন বিখ্যাত ইলোরার শৈলগাত্রে সম্রাট কৃষ্ণ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৈলাস-মন্দির রচনা করিয়াছিলেন আজিও তাহা জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার সাম্রাজ্য কবে ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গিয়াছে—তাঁহার বিজয়ী সেনাপতির নাম পর্য্যন্ত কেহ আর এখন জানে না—কিন্তু তাঁহার কৈলাস-মন্দির শোভায় ও সম্পদে অতুল হইয়া আজিও স্বদেশে ও বিদেশে পর্য্যন্ত পূজা লাভ করিতেছে। সম্রাট প্রথমকৃষ্ণ এই কৈলাস-মন্দিরেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সে মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় স্তম্ভাবলী, তাহার নভোন্নত চূড়া, তাহার সৌষ্ঠব পাষাণগাত্রে যে সুষমা ফুটাইয়াছে, তাহা সেকালের ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন।

ইলোরার কৈলাস মন্দির

সম্রাটকৃষ্ণের বংশধরগণ কেহই সমরে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যাহাতে রাষ্ট্রকূট রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সকলেই প্রাণপণে সে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যে রাজপুত বৎসরাজ একদিন বঙ্গ ও গৌড়ের

ধ্রুবধারাবর্ষ

নরপতি দিগকে সমরে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের শরদিন্দু ধবল রাজচ্ছত্রদ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যাঁহার বিক্রমে সেকালে সমস্ত উত্তরাপথ কম্পিত হইয়াছিল, মান্যক্ষেটের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারবর্ষ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ-পুতানার মরুমধ্যে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেকালের মান্যক্ষেট একালের মলকৃহেড। উহা নিজামের রাজ্যে অবস্থিত। এইখানেই সে সময়ে রাষ্ট্রকূটদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট

রাষ্ট্রকূটগণ আপনাদিগকে যদুবংশজাত বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন অধিবাসী। মৌর্য্যসম্রাট অশোকের কালেও মহারাষ্ট্র দেশে রট্ট বা রাষ্ট্রকূটগণ বাস করিত বলিয়া জানা যায়। রাষ্ট্রকুটগণ জাতিতে রাজপুত। প্রাচীন কালে উত্তর-ভারতে যেমন চৌহান্, পরিহার, তোমর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ রাজত্ব করিত, তেমনি দক্ষিণ-ভারতেও চন্দেল্ল, কলচুরি বা হৈহয় গহর্ওয়ার, এবং রাষ্ট্রকূটগণ নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-ভারতের রাজপুতদিগের সহিত দক্ষিণ-ভারতের রাজপুতদিগের যুদ্ধের কাহিনীই এককালের ভারতের ইতিহাস।

রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুবধারাবর্ষের পর দুইশত বৎসরের মধ্যে যে সকল নরপতি রাষ্ট্রকূট রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, অমোঘবর্ষের নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। এই সময়েই জৈন ধর্ম্ম তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে দক্ষিণ-ভারতে হীনপ্রভ করিয়াছিল। দিনে দিনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তেজ ও শক্তি হারাইয়া শেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে একরূপ বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল।

চোল কর্ত্তৃক চালুক্য দিগের পরাজয়

এই দুইশত বৎসরের মধ্যেই বাতাপির রাষ্ট্রকূটগণ হীন গৌরব হইয়া পড়িল। দক্ষিণাত্যে রাজপুতে রাজপুতে বিবাদ বাধিল। সেই বিবাদে জয়লাভ করিয়া চালুক্য দ্বিতীয় তৈলপ যে চালুক্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় দুইশত বৎসরকাল রাজপুতদিগের গৌরবের কারণ হইয়া ছিল। খ্রীষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে পূর্ব্বকথিত চোল সম্রাট রাজ নববুই সহস্র সেনা লইয়া রাষ্ট্রকূট রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সেনাগণ বালক, বৃদ্ধ স্ত্রী, পুরুষ কাহাকেও রাখিল না! যে পলায়ন করিতে পারিল সে-ই কেবল বাঁচিল। সেনাগণ যদৃচ্ছা লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া দেশে রুধিরস্রোত বহাইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাপথের চালুক্য-প্রতিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশের কথা

শুধু রাজার কথা দেশের কথা নহে—রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহের কথাও দেশের কথা নহে। প্রজার কথাই দেশের কথা। তাহার সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, শিক্ষা ও সভ্যতা তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ, রাজ্যের শাসন-তন্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রভৃতিই দেশের কথা। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে কেহ তেমন করিয়া ইতিহাস রচনা করিত না বলিয়া এ সকল বিষয় ভালো করিয়া জানা যায় না।

দেশের কথা

আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠিত যাগ যজ্ঞ বিধি যখন উত্তর ভারতের প্রধান ধর্ম্ম হইতেছিল তখনো উহা দক্ষিণাপথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে যখন আর্য্য সভ্যতা দক্ষিণাপথেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথের ধর্ম্মমতও দক্ষিণে স্থান পাইয়াছিল।

ধর্ম্মমত

ক্রমে ক্রিয়া কর্ম্মের বাহুল্য ও যজ্ঞবেদীতলে জীবহত্যা লোকের প্রাণে আর তেমন শান্তি দিতে পারিল না। লোকে সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতে লাগিল তবে কি জীব বধ না করিলে ভগবানের করুণা কিছুতেই লাভ করিতে পারা যায় না ? সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধ এবং মহাবীর জন্মলাভ করিয়া প্রচার করিলেন জীবে প্রীতিই শ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান প্রেমময়—রক্ত নহে, ফুল দিয়াই তাঁহার পূজা হয়। এই প্রেমের মন্ত্র দিনে দিনে, মাসে মাসে উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রচারিত হইতে লাগিল—নানা সম্রাট নানাভাবে এই মন্ত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন। শেষে আর্য্যদিগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল। ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিল। মন্দিরের পর বিরাট মন্দির সকল মাথা তুলিতে লাগিল—চৈত্যের পর চৈত্য, স্তূপের পর স্তূপ কত নগরীর শোভা সম্পাদন করিল। কত বৃহৎ বিহারে ভ্রমণ বা সন্ন্যাসগিণ দিনের পর দিন নানা শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। উত্তর-ভারতের এই ধর্ম্ম-তরঙ্গ যে দক্ষিণাপথেও আসে নাই তাহা নহে।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে যখন পরিব্রাজক ওয়ান্‌-চোয়াং দক্ষিণ-ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তথায়

জৈন ধর্ম্ম প্রবল ছিল। পাণ্ড্যরাজগণ জৈন ধর্ম্মের প্রচার ও পরিপুষ্টির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু শিবের উপাসক চোলরাজগণ যখন দক্ষিণাপথের কর্ত্তা হইলেন তখন জৈনদিগের নিগ্রহের অবধি রহিল না। শুনিতে পাওয়া যায় সুন্দর নামে কোন রাজা আট হাজার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার শোণিতে ভূমিতল সিক্ত করিয়াছিলেন! হতভাগ্যগণ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ শূলের উপর প্রাণ দিয়াছিল! আর্কটের কোন একটী মন্দিরগাত্রে আজিও সেই ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী খোদিত প্রস্তরে বর্ত্তমান আছে।

সম্রাট অশোক দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উহা দক্ষিণাপথে সমুচিত শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রতিবাদী জৈন বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাতাপির চালুক্য রাজগণের কালে দক্ষিণাপথের ধর্ম্মমত অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ক্রমে আবার প্রবল হইতে লাগিল। অহিংসার স্থানে হিংসা আসিয়া দেখা দিল। নানা স্থানে যজ্ঞবেদী আবার জীব শোণিতে সিক্ত হইতে লাগিল। চারিদিকে বিষ্ণু মন্দির ও শিব মন্দির সগর্ব্বে শির তুলিল। আজিও সেই সকল

মন্দিরের জীর্ণস্তূপ সেকালের অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যের পরিচয় দিয়া থাকে। তখন পর্ব্বত গুহায় দেব মন্দির, রচিত হইতে আরম্ভ হইল। শতাব্দীর শেষ ভাগে চালুক্য রাজ মঙ্গলেস বাদসা বা বাতাপি রাজনগরে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, পর্ব্বত গুহায় দেব মন্দির রচনার তাহাই বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। তখনো মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণাংশে জৈন-ধর্ম্মের যথেষ্ট আদর ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন চালুক্য শক্তি হীন বল হইল, যখন চালুক্যরাজ তৃতীয় তৈলপ তাঁহার সেনাপতি বিজ্জল কর্ত্তৃক হৃত রাজ্য হইলেন তখন দক্ষিণাপথে যে ধর্ম্মমত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা 'লিঙ্গয়ৎ' বা 'বীরশৈব' নামে পরিচিত। বিজ্জল নিজে জৈন ছিলেন এবং অনায়াসে লিঙ্গায়ৎ সপ্রদায়ের দুইজন মহাপুরুষের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিলেন তাহার স্পর্শেই দক্ষিণ ভারতের শৈব মত নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছিল এবং হীন শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একেবারেই মৃতকল্প করিয়া তুলিয়াছিল।

যে মহাপুরুষের অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিচার শক্তি, যাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও একাগ্রতা যাঁহার নিষ্ঠা ও

সাধনা, ভক্তি ও চরিত্র ভারতে শৈব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল তিনি ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম বিশিষ্টা ও পিতার নাম ছিল শিবগুরু। তাঁহার প্রতিভা এতই ছিল যে যখন এক বৎসর বয়সের শিশু তখনই সমস্ত বর্ণপরিচয় তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর তখনই তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় একদিন তিনি দেখিলেন যে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতে পথশ্রমে তাঁহার মাতার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। সেই দিন হইতে তাঁহার আদেশে নদীর জল তাঁহারই গৃহ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত।

শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট

কথিত হয় যে শঙ্করের কোষ্ঠিতে লেখা ছিল যে তিনি যদি সন্ন্যাসী হন তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইবেন। নতুবা অষ্টম বর্ষ বয়সেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইবেন ইহা কি তাঁহার জননীর প্রাণে সহ্য হয়? তিনি

সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন না। ভাবিলেন, কোষ্ঠীর গণনা বোধ হয় ঠিক নহে। অষ্টম বর্ষ বয়সে শঙ্কর একদিন নদীতে স্নান করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরিল। শঙ্কর চীৎকার করিয়া কহিলেন—"তোমরা কে আছ, শীঘ্র আমার মাকে সংবাদ দাও—আমাকে কুমীরে ধরিয়াছে।"

সংবাদ পাইয়াই শঙ্করের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাটে আসিলেন। শঙ্কর কহিলেন—"মা আমি চলিলাম—আমাকে কুমীরে ধরিয়াছে। এখনো যদি তুমি সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দাও তাহা হইলে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে।" শঙ্করের মাতা তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"বাবার তুমি সহায় হও, আমি তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ দিতেছি।"

কুম্ভীর তৎক্ষণাৎ শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া গভীর জলে প্রস্থান করিল। শঙ্কর সেই দিন হইতে সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাসী শঙ্কর কাননে কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে নর্ম্মদার তীরে আসিয়া দেখিলেন যে একজন ঋষি তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু নর্ম্মদার বিপুল জলকল্লোলে তপের বিঘ্ন হইতেছে। শঙ্কর রুষ্ট হইয়া কহিলেন—"নর্ম্মদে, হয় তুমি নীরবে বহিয়া যাও, নতুবা এখনই তোমাকে জলশূন্য করিব।"

নর্ম্মদা যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে বহিয়া যাইতে-ছিল সেইরূপই চলিল। শঙ্কর মুহূর্ত্তে তাহাকে জলশূন্য করিলেন। তপস্বী যখন ইহা জানিতে পাইলেন তখন কহিলেন—"শঙ্কর নর্ম্মদায় জল আন, দেখিতেছ না সাত সহস্র জলচর প্রাণী মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে।"

আবার শঙ্করের আদেশে বারিহীন নর্ম্মদা তরঙ্গে তরঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

শঙ্কর যখন দ্বাদশ বর্ষের বালক তখন তিনি কাশীতে আসিয়া একজন মহাপণ্ডিত ঋষির সহিত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঋষি তাঁহাকে বর দিয়া কহিয়াছিলেন—"বৎস, পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিবে না। তুমি দিগ্বিজয়ী হইয়া আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবে।"

শঙ্কর মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই কালের মধ্যেই ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বেদান্তের ভাষ্য অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বিশ বৎসর বয়সে তিনি যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এক জীবন পাঠ করিয়াও এ কালের পণ্ডিতগণ তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন না।

বেহারবাসী মহাপণ্ডিত ঋষিকল্প কুমারিল ভট্ট এই যুগে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে আগমন করিয়া এরূপভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন যে সেই তরঙ্গের মুখে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছিল। কুমারিল ভট্ট যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ শঙ্কর তাহাতেই পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন।

সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য ও বাহুবল

দক্ষিণাপথের সাহিত্য ও শিল্পের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার মনোহর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আজিও বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া আছে। তাহার সম্পদ রাশি যে এক সময়ে বৈদেশিক বণিকদিগকে শতে সহস্রে আমন্ত্রণ করিয়াছিল, স্থানান্তরে সে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যে দেশে দাস প্রথা ছিল না; যে দেশের লোক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আর্য্য-সভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় করে নাই, যে দেশের সাহিত্য প্রবল ছিল—মনোহর ছিল—উন্নত চিত্তবৃত্তিগুলির পরিচয় দিত—স্বাধীন চিন্তার বিকাশ করিত, যে দেশের ললিত কথা প্রখ্যাত, যে দেশের বাহুবলে অসীম ছিল—সাহস অতুল ছিল, যে দেশের শক্তি স্থলে ও জলে সমভাবে বিকশিত

হইয়াছিল, সে দেশের লোক শাসনতন্ত্রেও যে যথেষ্ট উন্নতি দেখাইবে তাহাতে আর বিস্ময় কি।

রাজাই সর্ব্বকালে শাসনতন্ত্রের প্রধান স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু প্রজাদিগের মতাবলম্বী না হইলে তাঁহাকে বিপদগ্রস্থ হইতে হইত। রাজশক্তিকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য পাঁচটী মহাসভা ছিল। জনসাধারণ, পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং মন্ত্রীদিগের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা সেকালে সেই পঞ্চ মহাসভা গঠিত হইত। সদস্যগণ জনসাধারণের সুখ ও সুবিধার ব্যাবস্থা করিত—তাহাদিগের সঙ্গত দাবী যাহাতে প্রত্যাখ্যাত না হয়, সভাসদ্‌গণ সর্ব্বদা তাহার ব্যবস্থা করিতেন। পুরোহিতদিগের নির্দ্দেশে দেশের দেব-মন্দিরাদি ও ধর্ম্মমত পরিচালিত হইত এবং উৎসবাদি সম্পন্ন হইত। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য রাজা সচেষ্ট হইতেন। কোন্ শুভ লগ্নে কোন্ উৎসব করিলে দেশের মঙ্গল হইবে, জ্যোতিষী সদস্যগণ তাহাই নির্দ্ধারিত করিতেন। মন্ত্রীদিগের কার্য্য ছিল কর সংগ্রহ, বিচার-ব্যবস্থা ও আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ। রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটী সভাগৃহে সভা আহূত

পঞ্চ মহাসমিতি

হইয়া দিনের পর দিন কার্য্য চলিত। বিশেষ আবশ্যক হইলে পাঁচটী সভার সদস্যগণ ক্রমে মিলিত হইয়া রাজ-প্রাসাদে বা রাজার সভাগৃহে বসিয়া রাজার নেতৃত্বে দেশের কথার আলোচনা করিতেন। পাণ্ড্য, চোল ও চেরা রাজ্য যদিও পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক ছিল, কিন্তু একই রূপ শাসন প্রণালী সকল স্থানেই অবলম্বিত হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে সেখানে এক সময়ে শুধু দেবমন্দিরাদির তত্ত্বাবধান ও দান ধর্ম্মাদির ব্যবস্থার জন্য যে সভা ছিল তাঁহার সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় শত।

এমন একদিন ছিল যখন সাধারণ প্রজা মিলিত হইয়া দেশের রাজা নির্ব্বাচিত করিত। প্রত্যেক গ্রামই তখন ছিল শাসন তন্ত্রের এক একটী কেন্দ্র।

গ্রামনী

গ্রামের অধিবাসিগণ সভায় মিলিত হইয়া গ্রামপতি বা গ্রামনী নির্ব্বাচিত করিত। এই সকল সভায় ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই যোগদান করিতে পারি[illegible]। মিলিত গ্রামপতিগণ রাজনির্ব্বাচনে সহায় হইতেন।

প্রত্যেক সভায় গ্রামের সকল অবস্থার আলোচনা

হইত এবং আবশ্যক মত ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া গ্রামের কল্যাণ বিধান করিত। কর সংগ্রহ, বিচার, শান্তি রক্ষা প্রভৃতি সকল কার্য্যই সভা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত বলিয়া জানা যায়। স্থতরাং গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া সেকালে নিজগ্রামের শাসন ও রক্ষার ভার লইত। এই সকল সভায় গ্রামপতির যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সভার সদস্যগণ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে সংযত করিত। গ্রামের মঙ্গলার্থ যখন গ্রামপতিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে, এমন কি দূর দেশেও যাইতে হইত, তখন গ্রামের লোকগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

সভা

গ্রাম্যসভা যে শুধু করসংগ্রহ ও বিচার কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা নহে। শাসনের ভারও সভার উপর ন্যস্ত থাকিত। গ্রামের স্বাস্থ্য, পথ, ঘাট প্রভৃতি সকলই গ্রাম্য সভার তত্ত্বাবধানে ছিল। সাধারণ কার্য্যের জন্য কেহ কোন অর্থ বা সম্পত্তি দান করিলে সভা তাহা গ্রহণ করিত এবং দাতার নির্দ্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিত।

স্বাস্থ্য ও পথঘাট প্রভৃতি

গ্রাম্য সভার উপর এই সকল কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়া রাজা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন এবং সভাও উপযুক্ত সময়ে রাজার প্রাপ্য কর রাজকোষে অর্পণ করিত। গ্রামদ্রোহী সেকালে দণ্ডের ভয়ে থরহরি কম্পিত থাকিত —সভার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি তাহার ছিলনা।

সভার অন্যান্য কার্য্য

গ্রামের উন্নতি করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। সভা আবশ্যক বোধ করিলেই গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে বিশেষ কারণে বিশেষ কর আদায় করিয়া লইতে পারিত। কখনো বা গ্রামের সকলের জন্য। গ্রামবাসিদিগকে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিত। সে জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক দিবার রীতি ছিল না। বিপণীগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইত। এক এক প্রকারের সামগ্রী এক এক স্থানে বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা ছিল। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে গ্রামে অজন্মা হইলে পর সভার সদস্যগণ গ্রামবাসিদিগকে লইয়া ক্ষেত্র গুলি পরিদর্শন করিতেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে শস্য হয় নাই তাহার কর হ্রাস করিয়া দিতেন। কখন কখনো বা এই হ্রাস প্রাপ্ত কর সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে আদায় করা

হইত। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ কোন ক্লেশ ঘটিত না। যাহাদের শস্য নষ্ট হইয়াছে পরে সুদিন হইলে তাহাদিগকেই এই কর শোধ করিতে হইত। শত্রু কর্ত্তৃক গ্রাম আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কখন কখনো গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তির উপরই গ্রাম রক্ষার ভার ন্যস্ত হইত বলিয়া জানা যায়।

সভাগৃহ ও সভার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি

আজ যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার জন্য আমাদের দেশে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইতেছে, সেকালের পল্লীসমাজের শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ভারত-বাসী সে কালে জানিত যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে কার্য্যের সুবিধার জন্য নানাবিধ নিয়মাবলীর প্রয়োজন হয়। সঙ্ঘের প্রত্যেকেই সেকালে আপনাকে সেই সকল নিয়মের অধীন করিয়া রাখিত। কোথাও বা গ্রামের দেবমন্দিরে, কোথাও বা শাখা পত্র বহুল বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় গ্রাম্য সভার অধিবেশন হইত—কখন কখনো বা রাজা সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন।

গ্রামের সমুদয় লোক লইয়া পল্লী-সভা যে গঠিত হইত না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রামের

লোক মিলিত হইয়া অধিকাংশের মতে সভার সদস্য নির্ব্বাচন করিত। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একটী সভার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সমিতি বা কমিটি থাকিত। দাতব্যের, বা জলাশয়ের, সাধারণ উদ্যানের, বা সন্ন্যাসিদিগের এইরূপ নানা কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক সভার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিত। স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই সকল সমিতিতে যোগদান করিত বলিয়া জানা যায়।

সভার সদস্য নির্ব্বাচন

সভার সদস্য নির্ব্বাচন প্রণালী সেকালে অতি সুন্দর ছিল। সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রত্যেক গ্রামকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করা হইত। প্রত্যেক খণ্ডের অধিবাসী সেই খণ্ড হইতে সদস্য মনোনীত করিতে পারিত। রাজকর দাতা, নিজের ভূমির উপর যাহার বাস, ৭০ বর্ষের কম এবং ৩৫ বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ও শিক্ষিত গ্রামবাসী ভিন্ন অপরে গ্রাম্য-সভার সদস্য হইতে পারিত না। প্রত্যেক খণ্ডের অধিবাসিগণ সদস্য মনোনীত করিয়া তাহাদের নাম লিখিয়া দিত। নির্ব্বাচনের দিনে এই সকল নামের 'টিকিট' একটী পাত্রে রক্ষিত হইত। পাত্রে

ছিত টিকিটগুলি গ্রামের সকল অধিবাসিদিগের সম্মুখে ভাল করিয়া নাড়িয়া মিশানো হইলে, একটী বালক পাত্র হইতে এক এক খানি করিয়া টিকিট বাহির করিয়া সভা নেতার হস্তে প্রদান করিত। তিনি তখন টিকিটে লিখিত নাম পড়িয়া শুনাইতেন। এই রূপে সেকালে গ্রামের প্রত্যেক অংশের জন্য এক এক জন সভ্য এক বর্ষের জন্য মনোনীত হইত। কর্ম্মক্ষেত্রে সদস্যদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন বিষয় অপরাধী দেখিলে সভা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দিত এবং পুনরায় পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থামত নূতন সদস্য গ্রহণ করিত। এই নির্ব্বাচন প্রথা সেকালে সম্রাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ছিল। যেমন গ্রামে, তেমনি নগরেও নাগরিকদিগের সভা ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

সভার সদস্য অপরাধী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে শুধু যে তাহাকেই সভা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত তাহা নহে, সদস্যের আত্মীয় বা বংশধরগণও কলঙ্ক টীকা লাভ করিত এবং সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিত না। নিয়ম এত কঠোর ছিল বলিয়াই সেকালে দুষ্টলোক সভায় থাকিতে পারিত না। সদস্য মাত্রেই অতিশয় পবিত্র চিত্তে ও সাবধানে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিত। যাহার চরিত্র

মন্দ, যে সুরাপায়ী, চৌর যে, কুচরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত যাহার বাস, পঞ্চমহাপাতকের কোন একটী করিয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি কলঙ্কলাঞ্ছিত এমন কোন ব্যক্তি গ্রাম্য সভায় নির্ব্বাচিত হইতে অধিকারী ছিল না। পরস্বাপহারী দস্যু, এমন কি অবিমৃষ্যকারী বা গ্রাম-দ্রোহীরও সভায় স্থান ছিল না।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি

গ্রামের ভূমির উপর সেকালে গ্রাম্যসভারই সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। গ্রামের সকলের অভিমত না লইয়া স্বয়ং রাজাও কোন নূতন লোককে একখণ্ড ভূমি দান করিতে পারিতেন না। নিয়ম মত রাজকর দিলেই রাজা সভার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না বটে, কিন্তু সভার আয় ব্যয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত সেকালে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। সভা নিজ কর্ত্তব্য পালন না করিলে রাজা অর্থদণ্ড করিতেন। কোন কোন বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়নকালে রাজার সম্পত্তি লওয়া প্রয়োজন হইত না তাহা নহে, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রাম্য-সভা সকল কার্য্য স্বাধীন ভাবেই করিত—কেহ তাহাতে বাধা ঘটাইতে পারিত না। দেশের রাষ্ট্রনীতির সহিত সেকালে এইরূপে প্রত্যেক গ্রামের যে সম্বন্ধ স্থাপিত

হইয়াছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলেই রাজাকে গ্রাম্য-সভার অভিমত গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে রাজশক্তিরও উপরে প্রজাশক্তির আসন ছিল। রাজাই সর্ব্বোপরি সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও সেকালে প্রজা নিজের জন্মগত অধিকারকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিত না।

সম্মিলিত পল্লীসঙ্ঘ বা 'ইউনিয়ন'

আজ কাল আমরা দেখিতেছি দেশের কতকগুলি গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইয়াছে। সেই সকল সঙ্ঘ 'ইউনিয়ন' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থা যে নূতন তাহা নহে। সুপ্রাচীন কালেও দেখিতে পাই যে একাধিক গ্রাম এক সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের উন্নতি বিধান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইত। কখনো বা বহু গ্রামে বিভক্ত একটী বিস্তৃত জনপদ পার্শ্ববর্ত্তী অন্য আর একটী বিস্তৃত জনপদের সহিত অনায়াসে সঙ্ঘবদ্ধ হইত। ক্ষুদ্র স্বার্থ বা দলাদলি, এখন যাহা বাঙ্গালার গ্রামকে প্রতিদিন মৃতবৎ করিতেছে, সে কালে তাহার এতদূর বিস্তৃতি ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ

শতাব্দী পর্য্যন্ত যে দক্ষিণাপথে এইরূপ শক্তিশালী পল্লী-সমাজ বর্ত্তমান ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল প্রমাণের অধিকাংশই এখন নানা স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন লেখমালা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে মুসলমান

বহু প্রাচীনকালে আরব বণিকগণ পারস্য উপসাগরের প্রধান বন্দর সিরাফ্ এবং হরমুজ হইতে যাত্রা করিয়া বাণিজ্যের জন্য সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া উপনীত হইত, কেহ কেহ বা দূরবর্ত্তী মালাবার তটে পর্য্যন্ত যাইত। ভারতের মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যখন তাহারা ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের কাহিনী বর্ণনা করিত, তখন তাহাদের দেশের লোক সবিস্ময়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিত। ভারতের তীরে তীরে মণিমুক্তা, ভারতের নদীর জলে সোণা—সেখানে সোণার গাছে হীরার ফুল ফোটে! সে ফুল তুলিয়া আনিলেই হইল! এ কাহিনী শুনিলে কাহার হৃদয়ে না লোভ আসে? তাহারা যখন শুনিত যে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে বিচিত্রকায় রত্নভূষিত শ্রীমূর্ত্তি সকল বিরাজ করে—সে সকল দেবমন্দির পর্য্যন্ত হীরকে কনকে সুশোভিত—তখন আরবের লোক আর স্থির

আরব বণিক

থাকিতে পারিত না। ভাবিত, এমন একটা সোণার খনি ভারতবর্ষ—আর সেখানে কিনা কুসংস্কারের বদ্ধ-বিধর্ম্মীদিগের বাস! তাহারা পুতুল লইয়া পূজা করে, ইট-পাথরে ভক্তির ফুল চন্দন দেয়! আরবগণ দেখিল বিধর্ম্মীদিগকে জয় করিলে, দণ্ড দিলে পুণ্য লাভ হইবে।

মুসলমান-শক্তির তখন জয়ের যুগ। সে শক্তি তখন পৃথিবীর নানা দেশে আপনাকে প্রবিষ্টিত করিতেছে। সপ্তম শতাব্দীর সেই উষায় খলিফা হজরৎ ওমরের পতাকা বহন করিয়া তখন বর্ষের পর বর্ষ মুসলমান বণিকগণ ভারতে আসিতে লাগিল। সে সকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুধু লুণ্ঠন—ভারতে রাজ্যস্থাপন নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সিন্ধু দেশের সহিত মুসলমানদিগের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহম্মদ ইবন্ কাসিম

অষ্টম শতাব্দীর উষায় যখন বাল্‌দিয়ার শাসনকর্ত্তা মৃজ্জাজ তাতার দেশ জয় করিবার জন্য অগণিত সেনা পাঠাইলেন তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ ইবন্ কাসিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কাসিম তখন সপ্তদশ বর্ষের যুবক মাত্র। কিন্তু তাঁহার অসীম সাহস ও প্রথম যৌবনের তীব্র উৎসাহ তাঁহাকে একান্ত দীপ্ত করিয়া

তুলিল। খলিফা দেখিলেন, ভারতবর্ষ বহুদূরে! অত দূরদেশে সেনা প্রেরণ করিতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইবে—বহু প্রাণ বিনষ্ট হইবে। দেশ অপরিচিত—তাহার বলাবল অজ্ঞাত—তাহার পথ ঘাট কেহ জানে না! এমন দুঃসাহসিক অভিযানে লিপ্ত হইতে খলিফার শঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু কাসিম দেখিলেন ভারত-বর্ষকে তখনো মুসলমানের কৃপাণ স্পর্শ করে নাই—ভারতে তখনো দিন্ দিন্ রব উঠে নাই। ভারত সভ্যতা প্রাচীন, জ্ঞানে প্রবীন, সম্পদে কুবের। এমন দেশ জয় করিতে চেষ্টা না করিলে আর বীরত্ব কোথায়! তিনি কোন বাধা মানিলেন না। ছয় সহস্র বাছা বাছা অশ্বারোহী এবং বহু পদাতিক সঙ্গে লইয়া তিনি বীর বিক্রমে অগ্রসর হইলেন এবং সহসা এক দিন দৈবল আক্রমণ করিলেন।

দৈবলের দেবমন্দির জয় করিতে বেশীদিন লাগিল না। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ প্রাণ পনে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন, শোনিতের নদী বহিল—মুসলমানের কামানের ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া হত্যা ও লুণ্ঠনের পর কাসিমের বিজয়ী সেনা অমিত বিক্রমে সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হইল। কাসিম

আরব কর্তৃক সিন্ধুবিজয়



তুর্কগণ একদিন সেই পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

দক্ষিণাপথ পৃ—৬৭।

নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া সিন্ধু নদ অতিক্রম করিলেন। হিন্দুসৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। দাহির পশ্চাতে হটিয়া গিয়া সেনা সমাবেশ করিলেন। হিন্দু রাজা সেদিন মরণ পণ করিয়া যুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ এই প্রথমে দেখিল যে বিপুলকায় এক একটা হস্তী যুদ্ধের অপেক্ষায় শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। হিন্দু নারিগণ সে দিন শত্রুর হস্ত হইতে মান রক্ষা করিবার জন্য জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের পবিত্র চিতার তপ্ত অগ্নি স্পর্শ করিয়া হিন্দু-যোধগণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর নৃপতি দাহির মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যে সকল হিন্দু সেনা তখনো জীবিত ছিল—তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। জয়ে উল্লসিত মুসলমান সেনা নব বলে বলীয়ান হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হিন্দুগণ এই বিপদের দিনেও গৃহ-বিবাদ ভুলিতে পারিল না। দেশ যায় যাউক তবুও প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্চশির অবনত করিতেই হইবে, এই ঘৃণিত নীতি অবলম্বন করিয়া অনেকে মুসলমানদিগের সহায়তা পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। আরবগণ এইরূপে সিন্ধুদেশ জয় করিল বটে, কিন্তু সে জয়ে বিশেষ কোনো লাভ হইল না। সিন্ধুদেশ মরুময়। এত

রুধির পাতে মরুভূমি মাত্র জয় করিয়া ফল কি ? আরবগণ সে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া শস্যশ্যামল প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য আর অগ্রসর হইল না। রাজপুতগণ তাহাদিগের পথে যে প্রবল বাধা জন্মাইল, মুসলমান সেনা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না। খলিফাও নূতন সৈন্য পাঠাইয়া কাশিমের বলবৃদ্ধি করিলেন না। মহম্মদ ইবন্-কাশিমের প্রাণান্ত চেষ্টা এইরূপে বিফল হইল।

কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। আরবদিগের যুদ্ধকাহিনী লোকে বিস্মৃত হইল—আরব-বিজয়ের উল্লেখযোগ্য চিহ্নও আর তেমন পরিস্ফুট রহিল না। এক দিন যে পথে হুণ, এবং যবনগণ উল্কার মত আসিয়া ভারতবর্ষের উপর পতিত হইয়াছিল—যে পথে আসিয়া তাহাদের বংশধরগণ একদিন উত্তর ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বসতি করিয়া, বৈদিক রীতি নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নিজেদের মুদ্রা কথঞ্চিতও অঙ্কিত করিয়াছিল—যে পথ ধরিয়া এক দিন গ্রীক বীর সেকেন্দর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুরুরাজের সিংহবিক্রম দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন—যে পথে এক দিন ব্যাকট্রিয়গণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে

তুর্ক

নিজেদের শিল্প ও সভ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তুর্কগণ একদিন সেই পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সে পথ দুর্গম—সে পথ অত্যুন্নত শৈল প্রাচীরে বেষ্টিত—সে পথ হিমালয়ের দেহ ভেদ করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া ভারতের দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া এক দিন তুর্কগণ বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইল। খলিফার রাজধানী তখন দমস্কাস হইতে বাগ্দাদে স্থাপিত হইয়াছে —তখন আরব রীতি নীতির সঙ্গে পারসিক রীতি নীতি ও জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া মুসলমানদিগকে নববল প্রদান করিয়াছে; তখন তুর্ক আলপ্তিগিণ আফগানিস্থানের শৈল-প্রাচীরে বেষ্টিত গজনীতে একটী নবীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

সাবুক্তিগিন

এই নবরাজ্য দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। আলপ্তিগিনের কৃতদাস সাবুক্তিগিন এই গজনীরাজ্যকে নবসম্পদে ভূষিত করিলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র তখন ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ খোরাসানের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। সাবুক্তিগিন উত্তর-পশ্চিম গিরিপথে অগ্রসর হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। হিন্দু রাজা জয়পাল তাঁহার নিকট বারংবার পরাজিত হইলেন বটে—কিন্তু ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হইল না।

তাহা না হউক, তিনি যে পথ দেখাইলেন তাহাই পরে ভারতে সুবিশাল মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত করিবার সহায় হইয়াছিল।

গজনীর মহম্মদ

সাবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর পুত্র মহম্মদ রাজমুকুট ধারণ করিলেন। তাঁহার আকাঙ্খা অতিশয় প্রবল ছিল। ক্ষুদ্র গজনী রাজ্য সে আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। তিনি বলসংগ্রহ করিয়া বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন—বারবার জনপদের পর জনপদ লুণ্ঠন করিলেন—বার বার মন্দিরের পর দেবমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন। প্রবল সিন্ধু, খরস্রোত চেনাব এবং ঝিলাম্ রাবি এবং সট্লেজ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। দুর্ভেদ্য দুর্গ, সুরক্ষিত নগর, সুসজ্জিত হিন্দু সেনা—কিছুই মহম্মদকে বাধা দিতে পারিল না। মথুরার দেব মন্দির লুণ্ঠিত হইল, কাণ্য-কুব্জের সাতটী দুর্গ একদিনে পরাজয় মানিল—লাহোর, কলঞ্জর, গোয়ালিয়র একে একে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া গেল। সোমনাথের সুবিখ্যাত শিবমন্দির, যেখানে প্রতিদিন শত সহস্র হিন্দু পূজা করিবার জন্য সমবেত হইত, সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যেখানে হর হর বম্ বম্ নাদ করিয়া শিবলিঙ্গের শিরে গঙ্গাবারি ঢালিত—সহস্র

যোদ্ধা কৃপাণে কার্ম্মুকে সজ্জিত হইয়া যে মন্দির রক্ষা করিত—মহম্মদের বিজয়ী সেনা বহু শোনিতপাত করিয়া তাহাও লুণ্ঠন করিল।

এইরূপে বিজয় লাভ করিয়াও মুসলমানগণ ভাবে নাই যে ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত করিতে হইবে। তাহারা ভাবিয়াছিল বিধর্ম্মিদিগকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া, অর্থ লুঠিয়া শ্রীমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিলাম—মুসলমান-ধর্ম্মের আদেশ পালন করিলাম।

দিনে দিনে গজনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া খসিয়া ধ্বসিয়া গেল। যে প্রবল শক্তি ইহা সম্পন্ন করিয়াছিল তাহা ভিন্ন দেশ হইতে আসে নাই। গজনী এবং হিরাটের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশেই তাহা জন্ম লাভ করিয়াছিল। সে প্রদেশ ঘোর রাজ্য নামে বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথ্বীদহনকারী (জাহান্-সোজ) আলাউদ্দীন রাজনগরী গজনী আক্রমণ করিলেন। গজনীর শত শত অট্টালিকা সে আক্রমণে ধূলিতে পরিণত হইল—স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলের শোণিতে রাজপথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। আলাউদ্দীন ইহাতেই তুষ্ট হইলেন না। মৃত সুলতানদিগের

ঘোরের মহম্মদ

সমাধি খুঁড়িয়া আলাউদ্দীন তাঁহাদের কঙ্কালরাশি পর্য্যন্ত শৃগাল কুকুরের আহারের জন্য ছড়াইয়া ফেলিলেন! আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র মুইজুদ্দীন বহুসেনা সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। গজনীর মহম্মদ যে ভাবে এবং যে পথে আসিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সিন্ধু হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশকে লুণ্ঠন-ব্যস্ত করিয়াছিলেন, ঘোরের মহম্মদও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সেইরূপ করিলেন।

পৃথ্বীরাজ

মহম্মদ ঘোরি মুলতান জয় করিলেন, সিন্ধু রাজ্য তাঁহার চরণ চুম্বন করিল, তিনি লাহোর জয় করিয়া শিয়ালকোটে দুর্গ স্থাপিত করিলেন এবং সিরাহিন্দ আক্রমণ করিলেন। চৌহান কুলতিলক পৃথ্বীরাজ বহু রাজপুতবীর লইয়া যখন মহম্মদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন মহম্মদ দেখিলেন রাজপুতের বীরপণা অসীম—তাহাদের রণনিপুণতা বিস্ময়কর—তাহাদের আক্রমণ দুঃসহ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১১৯১ খৃঃ অঃ) পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে মহম্মদের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। তিনি পরাজিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাইয়া চলিল বিজয়ী রাজপুত সেনা।

দেশে ফিরিয়া মহম্মদ নয়নের নিদ্রা হারাইলেন, আহারে রুচি হারাইলেন। এই দারুণ পরাজয় তাঁহাকে জীবন্মৃত করিয়াছিল। তিনি অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। পর বৎসরেই তাঁহার এক লক্ষ বিশ হাজার সেনা উল্কার বেগে ভারতের দিকে ধাইয়া আসিল। পৃথ্বীরাজ সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার গৃহ-বিবাদ ভারত-বর্ষের কাল হইল। মহম্মদ যেখানে গেলেন সেইখানেই জয় লাভ করিলেন। আজমীর, হান্‌সি—গোয়ালিয়র, বদাউন—কল্পি, কলিঞ্জর সমস্তই মহম্মদের নিকট পরাভব মানিল। মহম্মদ ভারতবর্ষে রাজপ্রতিনিধি স্থাপিত করিয়া বিজয়গর্ব্বে স্বদেশে ফিরিলেন। মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিই দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান। আজিও দিল্লীর কুতব মিনার তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

মহম্মদের প্রতিশোধ

মহম্মদ ইবন্ কাশিমের সিন্ধু তট আক্রমণের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া (৭১২ খৃঃ অঃ) দিল্লীর প্রথম সুলতানের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসরের চেষ্টায় উত্তর-ভারতে মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন

তুর্ক প্রতিষ্ঠার পরাজয়

পর্য্যন্তও সুলতানগণ দক্ষিণাপথের দিকে ধাবিত হন নাই। দাস-সুলতান কুতুবুদ্দীনের কাল হইতে মোগল-রাজ বাবরের ভারতাভিযান পর্য্যন্ত (১২০৬-১৫২৬) ৩২ জন মুসলমান সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সম্রাটগণ ৫টী ভাগে বিভক্ত —দাস, খল্‌জি, তোঘলক, সৈয়দ, এবং লোদী। মোগল বাবর পাণিপথের ক্ষেত্রে লোদীদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতে মোগল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার আসাতেই ভারতের তুর্ক প্রতিষ্ঠা বিচূর্ণিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর যে মোগলরাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আরাংজেবের মৃত্যুর পর তাহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণাপথে মুসলমান

গজনীর মহম্মদ বা ঘোরের মহম্মদ যখন উত্তর-ভারতে হত্যা ও লুণ্ঠন করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণাপথে হিন্দুরাজগণ নিজেদের স্বাধীনতা ও সম্পাদ লইয়া নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে মুসলমানগণ একদিন প্রবল বন্যার ন্যায় দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিবে—বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত সে স্রোতের গতি রোধ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাষ্ট্রকূটদিগকে পরাজিত করিয়া চালুক্যগণ কল্যাণ নামক রাজনগরীকে বেষ্টন

দেবগিরি
দ্বার সমুদ্র
ওরঙ্গল

করিয়া যে চালুক্য প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা আরও একশত বৎসর পর্য্যন্ত গৌরবে ও সম্ভ্রমে বিরাজ করিল। তাহার পর চালুক্যের পতন আরম্ভ হইল। চালুক্য রাজের অধীনস্থ কতকগুলি সামন্তরাজ ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মহিশূরের অন্তর্গতঃ আধুনিক হলেবিড্ বা সেকালের দ্বারসমুদ্র নামক নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া যাদব বংশের কোন নৃপতি সেই পুরাকালে হয়শালা নামক একটী রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। চালুক্যদিগের যখন জীর্ণদশা, দ্বাদশ শতাব্দীর সেই শেষ পাদে হয়শালা-রাজ বীর বল্লাল চালুক্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করিলেন। যাদব বংশের একটী শাখা আধুনিক খান্দেশ নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারাও এই সুযোগে উত্তর হইতে আসিয়া চালুক্যদিগের পতন ঘটাইলেন এবং প্রাচীন দেবগিরি বা আধুনিক দৌলতাবাদ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। হয়শালাগণ দেখিল উত্তর হইতে আগত এই প্রবলপ্রতাপ প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে পরাভুত না করিলেই চলে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধে প্রথমে হয়শালাদিগের জয় হইলেও পরে দেবগিরির যাদবদিগের প্রতিষ্ঠাই প্রবল হইয়া উঠিল।

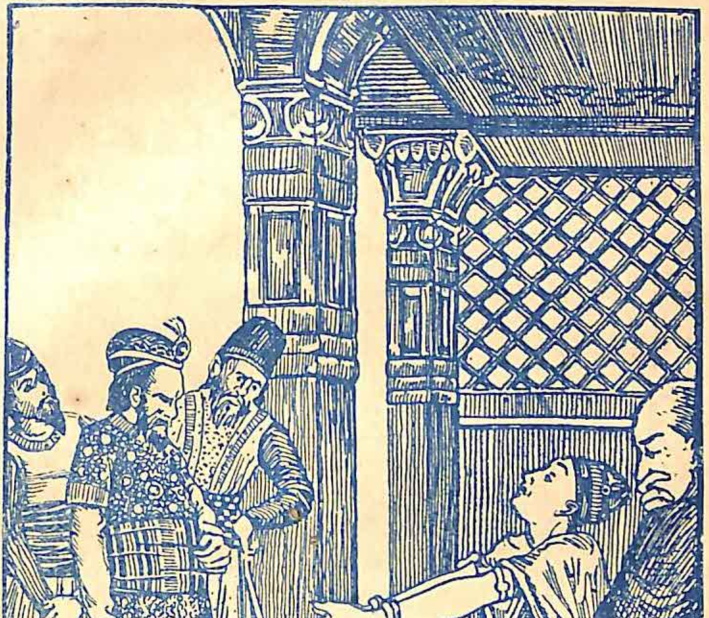
এই সময়ে তেলিঙ্গনা রাজ্যে ককতিয় নামক একটী রাজবংশ বর্ত্তমান ছিল। ওরঙ্গল নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া জানা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন উত্তর-ভারতে মুসলমানগণ সুপ্রতিষ্টিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যগুলি আত্মকলহে ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। দেবগিরি ও দ্বারসমুদ্রের যাদবগণ, ওরঙ্গলের ককতায়ি রাজবংশ এবং উড়িষ্যার গঙ্গা বংশ সেকালের দক্ষিণাপথে প্রাধান্য লাভ করিল। কালচক্রে এইরূপে পুরাতনের তিরোধান ঘটিল এবং নবীনের আগমন পথ ধীরে ধীরে মার্জ্জিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বৃদ্ধ জালালুদ্দীন খেল্‌জি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া নিজের পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দীন বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ যমুনা তীরে কড়ায় বাস করিতেন। তিনি শুনিলেন, দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি ধনসম্পদে অতুল। সেই ধন লাভ করিতে পারিলেই তিনি সেনা সংগ্রহ করিতে পারেন। সেনা সংগৃহীত হইলেই তিনি অনায়াসে দিল্লীর

আলাউদ্দীন ও দেবগিরি

বৃদ্ধ সুলতানকে পরাজিত করিয়া নিজেই সুলতান হইতে পারেন। সুতরাং দেবগিরির ধন লাভ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল! তিনি ঘোষণা করিলেন, বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা উচিত। দলে দলে মুসলমানগণ আসিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিল। তাহারা মনে করিল ধর্ম্ম যুদ্ধে যদি প্রাণও যায় তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ পরলোকে স্বর্গলাভ ঘটিবে। বৃদ্ধ শান্তিপ্রিয় দয়ার্দ্র-হৃদয় জালালুদ্দীন এ সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দের এক শুভ মুহূর্ত্তে সাত শত অনুচর লইয়া দুর্দ্ধর্ষ, রক্তপিপাসু নির্ম্মম নিরক্ষর আলাউদ্দীন দক্ষিণাপথ আগমন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন!

কোথায় যমুনা তীরে কড়া আর কোথায় বিন্ধ্যগিরির পরপারে দেবগিরি। পথ দুর্গম—বিপদ সঙ্কুল—নদনদীর বাধা দুরতিক্রম্য। আলাউদ্দীন সেই দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়া দেবগিরির সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কোনো মুসলমান সেনাপতিই বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করেন নাই—দক্ষিণাপথে মুসলমান আসে নাই। সুতরাং মুসলমান কাহাকে বলে দেবগিরির লোকে তাহা জানিত না। তাহারা তখন হিন্দু রাজা



তিনি বহু ধন দান করিয়া আলাউদ্দীনকে তুষ্ট করিলেন।

দক্ষিণাপথ পৃ—৭৭।

রামদেবের শাসনের অধীনে থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত। তাহাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাব ছিল না—মণি মুক্তার অভাব ছিল না। দেবগিরির দুর্গ পর্ব্বত শিখরে অধিষ্ঠিত। সে পর্ব্বত দুরারোহ—সরল ভাবে ঊর্দ্ধে শির তুলিয়াছে। দুর্গের প্রাচীর সুদৃঢ়, পরিখায় সুরক্ষিত। একটীর মধ্যে একটী, তাহার মধ্যে আর একটী এইরূপে তিনটী দুর্গ দেবগিরি নগর রক্ষা করিত। সে নগর শৈলপাদমূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেকালে উহা বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত ছিল।

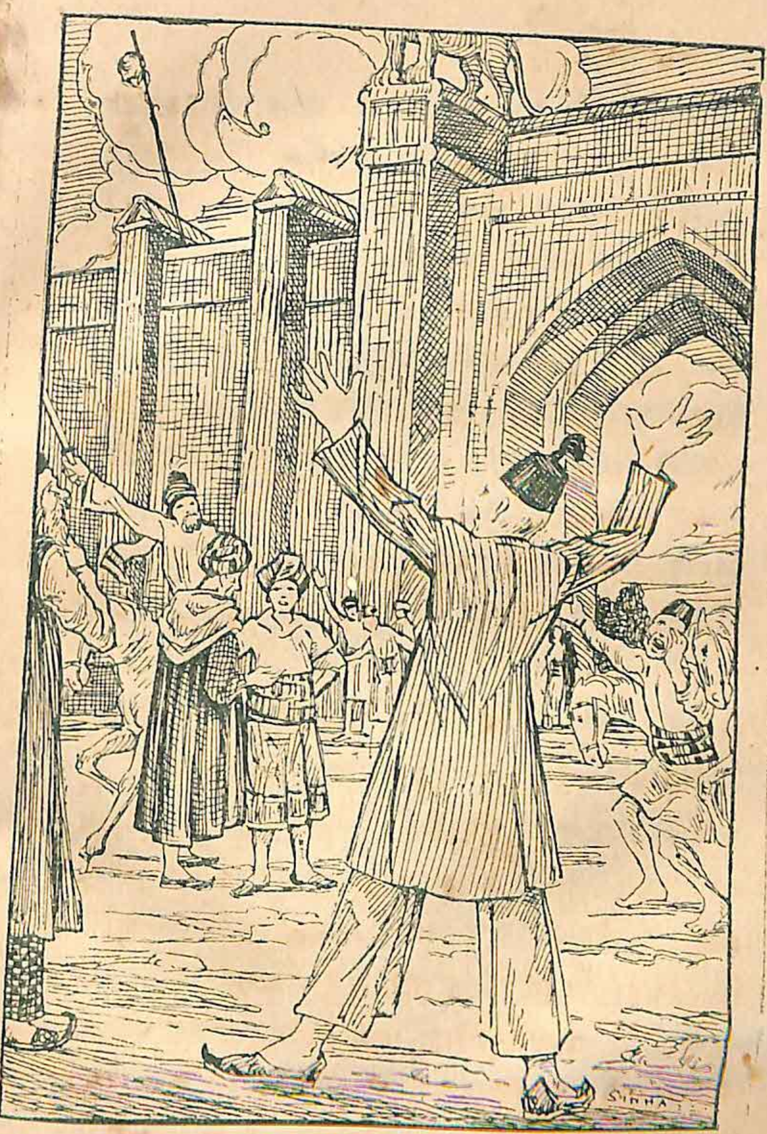
সানুচর আলাউদ্দীন অতর্কিতে দেবগিরির নিকটবর্ত্তী হইলেন। অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। হিন্দুসেনা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রামদেব দেখিলেন এই নূতন শত্রুর হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব নহে—তাহার পরাজয় সাধনও সাধ্যের অতীত। তিনি বহু ধন দান করিয়া আলাউদ্দীনকে তুষ্ট করিলেন। আলাউদ্দীনেরও শুধু ধনেরই প্রয়োজন ছিল। তিনি বিপুল সম্পদ লাভ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের লোভে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দক্ষিণাপথের সিংহদ্বার এইরূপে মুসলমানদিগের জন্য মুক্ত হইয়া গেল। সেই মুক্ত

দ্বারে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিতে তখন আর বাধা রহিল না।

সফল মনোরথ আলাউদ্দীন কড়ার পথে অগ্রসর হইলেন। সুলতান জালালুদ্দীন যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণাপথে অসাধারণ বিজয় লাভ করিয়া কড়ায় ফিরিতেছেন, তখন আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে সমারোহে অভিনন্দন করিবার জন্য নিজেই অগ্রসর হইলেন। সুলতানের সহিত যখন আলাউদ্দীনের সাক্ষাৎ ঘটিল তখন আলাউদ্দীন আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিতে দুষ্ট অনুচরগণ জালালুদ্দিনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল! আলাউদ্দীন দিল্লীর পথে অগ্রসর হইলেন এবং জনসাধারণকে তুষ্ট করিবার জন্য দিনের পর দিন তাঁহার গমন-পথে দেবগিরির স্বর্ণ মুদ্রা ছড়াইতে লাগিলেন। অর্থ লাভে তুষ্ট হইয়া জনসাধারণ সেই ঘৃণিত হত্যাকাহিনীর কথা আর মুখে আনিল না! আলাউদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সুলতান জালালুদ্দিনের হত্যা

দিল্লীর সুলতান হইয়া আলাউদ্দীন কয়েক বৎসর নানা কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও দক্ষিণাপথে



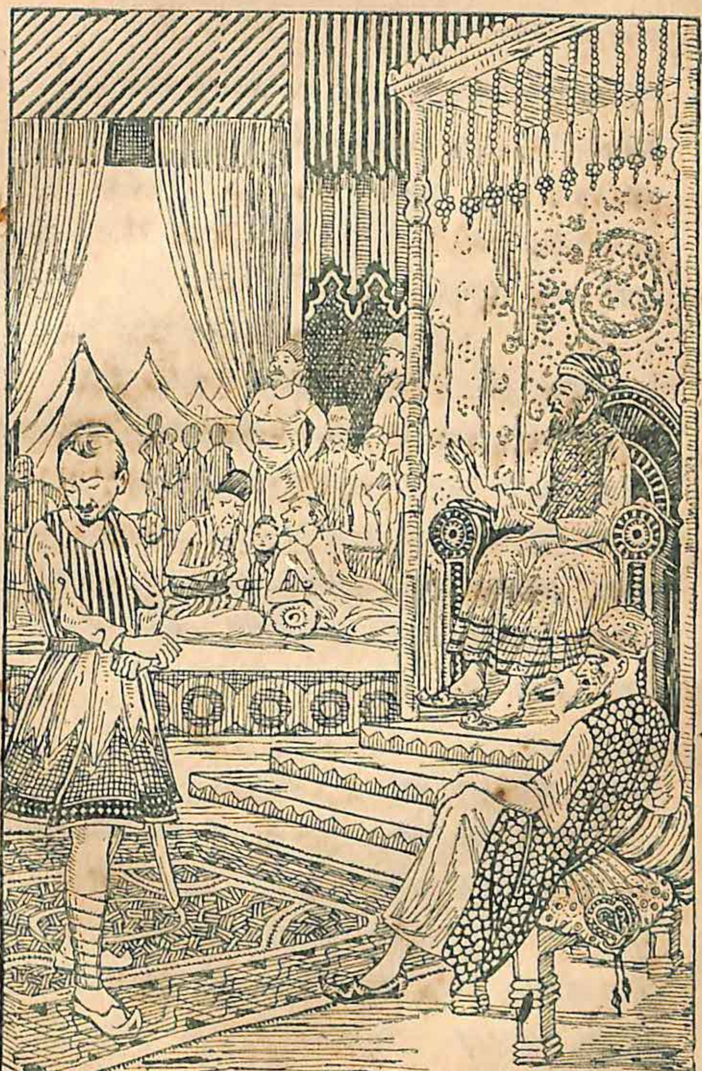
তখন আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে সমারোহে অভিনন্দন করিবার জন্য নিজেই অগ্রসর হইলেন।

দক্ষিণাপথ পৃ—৭৮।

অগ্রসর হওয়া ঘটিল না। কিন্তু দেবগিরির কথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। যে দেবগিরি তাঁহাকে রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াছে, অগণিত মণিমুক্তা দিয়াছে তাহাকে কি ভুলিতে পারা যায়? তিনি জানিতেন

হাজার দিনারি মালিক কাফুর ও দেবগিরি

দেবগিরিপতির ধনের সীমা নাই। সেই বিধর্ম্মী রাজা তাহার অতি সামান্য মাত্র দিয়াই আলাউদ্দীনকে বিদায় করিয়াছেন! সেখানে আরও আছে—আরও আছে। দেবগিরির রাজা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে বর্ষে বর্ষে রাজকর পাঠাইবেন, কৈ তাহাও ত আসে না! সুলতান আলাউদ্দীন আর বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার অধীনে তখন যে সকল সেনাপতি ছিলেন হাজারদিনারি মালিক কাফুর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। সুলতান তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সুলতানের আদেশে কাফুর অবিলম্বে দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। দেবগিরি আবার আক্রান্ত হইল। মুসলমান সেনা যেখানে গেল সে অঞ্চল ধ্বংস না করিয়া ছাড়িল না। রাজা রামদেব সপরিবারে বন্দী হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন! সুলতান আলাউদ্দীন রাজার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত



বন্দী প্রতাপরুদ্র সপরিবারে দিল্লী নগরে প্রেরিত হইলেন।

দক্ষিণাপথ পৃ—৮০।

করিলেন এবং বহু অর্থ ও উপঢৌকন দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। রামদেব তখন অকুণ্ঠিত চিত্তে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হইল। দেবগিরি বা দৌলতাবাদে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা স্থাপিত হইলেন। তথায় নামে মাত্র হিন্দু রাজার ক্ষমতা রহিল।

দেবগিরি করায়ত্ত হইল বটে, দক্ষিণাপথে মুসলমানের দাঁড়াইবার স্থান হইল বটে—কিন্তু তখনো ওরঙ্গল ছিল, দ্বার সমুদ্র ছিল, মালাবার তীর ছিল। বলিতে কি সমগ্র দক্ষিণাপথই ছিল। তাহার উপর ওরঙ্গলে ছিল হীরক ও কনকের খনি। তা হউক না সে সকল খণি তেলিঙ্গনা-রাজ প্রতাপচন্দ্রদেবের—কিন্তু প্রতাপ রুদ্র ত মুসলমান নয়—বিধর্ম্মী হিন্দু! সোণার ও হীরার খনিতে হিন্দু রাজার অধিকার কোথায়! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আলাউদ্দীন আবার বিজয়ী মালিক কাফুরকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন।

মালিক কাফুর ও ওরঙ্গল

সুলতানের আশীর্ব্বাদ লইয়া যখন মালিক কাফুর ওরঙ্গল জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন তখন সুলতান

বলিয়া দিলেন—ওরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রুদ্রের উপর বেশী অত্যাচার করিও না। তবে যতদূর পার টাকা আদায় করিতেও ছাড়িও না। রাজা যাহাতে বৎসর বৎসর কর দেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিও।' আভূমিনত হইয়া কাফুর স্থলতানকে অভিবাদন করিলেন এবং বিপুল বাহিনী লইয়া জয়গর্ব্বে অগ্রসর হইলেন।

দিল্লী হইতে ওরঙ্গল বহুদূর। পথ ঘাট তখন অনেকটা পরিচিত হইলেও তাহা পূর্ব্ববৎই দুর্গম রহিয়াছে। কাফুর সাবধানে অগ্রসর হইলেন। তিন মাসের শ্রমের পর কাফুরের সেনা তেলিঙ্গনা রাজ্যে প্রবেশ করিল। সর্বরদুর্গ জয় করিয়া তাহারা সে অঞ্চলের সমুদয় অধিবাসিদিগকে নির্ম্মমহৃদয়ে হত্যা করিল। দেশের নারীগণ মানরক্ষা করিবার জন্য দলে দলে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কাফুরের সেনা দেখিতে দেখিতে হনুস্কুণ্ডা শৈলের নিকটবর্ত্তী হইল। রাজনগরী ওরঙ্গল তথা হইতে মাত্র দুই ক্রোশের পথ। কাফুর দেখিলেন ওরঙ্গল নগর পর পর দুইটী প্রাচীরে স্থরক্ষিত। বাহিরের প্রাচীর মাটীর এবং ভিতরেরটী প্রস্তরের। সাত মাইল বেড়িয়া সেই প্রাচীর দুইটী পুর-রক্ষা করিতেছে। কাফুরের সেনাগণ

চারিদিকের বৃক্ষশ্রেণী কাটিয়া একটী দুর্গ রচনা করিল এবং তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ওরঙ্গল নগর আক্রমণ করিল।

দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রতাপ-রুদ্রদেব মরণ পণ করিলেন। কাতারে কাতারে হিন্দু সেনা মরিতে লাগিল। কাফুর যখন বাহিরের মৃন্ময় প্রাচীরটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন তখন জয়ের আর আশা নাই দেখিয়া প্রতাপ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুসলমান সেনার জয়নিনাদে কানন প্রান্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিজয়ী কাফুর দিল্লীতে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল তেলিঙ্গনারাজের শতাধিক হস্তী, সাত হাজার অশ্ব এবং সহস্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে অগণিত মণিমুক্তা। সুলতান আলাউদ্দীন দেখিলেন দক্ষিণাপথ মাত্র দুইবার লুণ্ঠিত হইতেই তাঁহার কোষাগারের বহু স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ সোণার গাছটীকে আরও নাড়িলে আরও যে কত হীরার ফল পড়িবে তাহা কে বলিতে পারে। ধন পাইলেই আবার পাইতে ইচ্ছা হয়—ধনতৃষ্ণা কোনো দিন মিটে না। যাহার এক-টাকা আছে, সে ভাবে আমার দুই টাকা হউক—যাহার এক সহস্র আছে, সে মনে করে

কতদিনে ইহা দুই সহস্র হইবে! সুলতান আলাউদ্দীনেরও তাহাই হইল।

শ্রান্ত ক্লান্ত কাফুরের ক্লান্তি দূর হইবার পূর্ব্বেই আলাউদ্দীন আবার তাঁহাকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন। এবার দেবগিরি এবং ওরঙ্গলের নৃপতিদ্বয় ভয়ে ভয়ে কাফুরকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

মালিক কাফুরের তৃতীয় অভিযান

দেবগিরিরাজ নিজের একজন সেনাপতি পর্য্যন্ত কাফুরের সঙ্গে পাঠাইলেন। তাঁহারা জানিতেন যে মুসলমান সেনা পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজন্যেরই সর্ব্বনাশ করিবে—দক্ষিণা-পথ হইতে হিন্দু রাজত্বের নাম মুছিয়া দিবে। কিন্তু বাধা দিবার সাহস তাঁহাদের ছিল না! তাঁহারা কাফুরকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ওরঙ্গল এবং দেবগিরি রাজ্য সেকালে আধুনিক মহীশূর রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাফুর ১৩১১ খৃষ্টাব্দে মহীশূর হইতে মদুরা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল মালাবার রাজ্য। মালাবারপতির দুইটী পুত্র তখন পিতৃসিংহাসন লাভ করিবার জন্য, এ উহার কণ্টক কাটিতে ব্যগ্র হইয়া ফিরিতেছিল! দ্বারে যে ভীষণ শত্রু

মালাবার বিজয়

আসিয়া আঘাত করিতেছে সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না! সেই ভীষণ বিপদের দিনে—যখন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুরাজ্যগুলি একে একে বিলুপ্ত হইতেছিল—কোথায় তখন সকলে মিলিত হইয়া সে বিপদকে নিবারণ করিবে, তাহা না করিয়া তখনো মালাবারের রাজকুমার দ্বয় কলহেই লিপ্ত রহিলেন। কনিষ্ঠ রায় বীর, জ্যেষ্ঠ রায় সুন্দরকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিলেন। হৃতসর্ব্বস্ব রায় সুন্দর তখন নিরুপায় হইয়া কাননে আশ্রয় লইলেন এবং শেষে সাহায্যের জন্য মালিক কাফুরের শরণাপন্ন হইলেন। কাফুর দেখিলেন পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রায় সুন্দরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মালাবার আক্রমণ করিলেন এবং রায় বীরকে কানন হইতে কাননে, শৈল হইতে শৈলান্তরে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার যাত্রাপথে যত মন্দির পড়িল সকলই চূর্ণিত হইল, লুণ্ঠিত হইল—যত নগর পড়িল সমস্তই রুধিরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মাদুরা শ্মশান হইয়া গেল। বিজয়ী কাফুর তখন লুণ্ঠনলব্ধ ধন-সম্পদের পরিমাণ করিবার জন্য মুক্ত প্রান্তরে উহা সজ্জিত করিলেন। দেখিলেন ৫১২টী হস্তী দেড় ক্রোশ পথ জুড়িয়া সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পার্শ্বেই

পাঁচ হাজার অশ্ব রহিয়াছে। ছিয়ানব্বুই হাজার মণ সোণা সেখানে সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হীরা মতি চূণী পান্না প্রভৃতিই পঁচশত মণ সংগৃহীত হইয়াছে! এদিকে কাফুরের বিজয়ী সেনা তখন সুদূর রামেশ্বর সেতুবন্ধে যে মস্জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার উচ্চ চূড়ায় মুসলমানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

এই সকল ধনরত্ন ও হস্তী এবং অশ্ব লইয়া কাফুর যে দিন জয় জয় নাদে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন সেদিন সেখানে কতই না মহোৎসব হইয়াছিল—সুলতান আলাউদ্দীন কতই না পুলকিত চিত্তে মালিক কাফুরের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। একদিন দাক্ষিণাত্য হইতে লুণ্ঠিত অর্থ লাভ করিয়া আলাউদ্দীনের হৃদয়ে শয়তান জাগ্রত হইয়াছিল এবং জালালুদ্দিনকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল—এবারও তেমনি সেই শয়তান কাফুরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া কেবলই তাঁহাকে কহিতে লাগিল—'কাফুর! আর কেন? এত অর্থ, এত বল, এত প্রতিষ্ঠা এত শক্তি তোমার। তবুও তুমি আলাউদ্দীনেরই দাসত্ব করিবে! জাগ্রত হও—

অসি ধর—আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ কর।' মালিক কাফুর শয়তানের আদেশে পীড়িত আলাউদ্দীনের মৃত্যুর দিন নিকট করিয়া দিলেন! আলাউদ্দীনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কাফুর তখন আলাউদ্দীনের দুইটী অসহায় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন এবং তৃতীয়টীকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। তখন তথাকার প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহিগণ একদিন নিদ্রিত কাফুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বক্ষে শাণিত ছুরি বসাইয়া দিল! আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া কাফুর যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল! আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মুবারক দিল্লীর সুলতান হইলেন। দেবগিরির হিন্দুরাজা সে সময়ে স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

দেবগিরিপতি হরপালদেব ও এক লক্ষ্মী দেব

এই সংবাদ যখন দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সুলতান মুবারক সসৈন্যে দেবগিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগিরিপতি হরপাল দেবের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। সুলতান মুবারকের আদেশে মমতাহীন ঘাতকগণ

হরপালের দেহ হইতে সকল চর্ম্ম কাটিয়া তুলিল। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হরপাল মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড শূলে প্রোথিত করিয়া দেবগিরি দুর্গের সিংহ দ্বারে রক্ষা করা হইল। কিছুকাল পর দেবগিরির নূতন রাজা একলক্ষী বিদ্রোহী হইলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহার নাসা ও কর্ণ কাটিয়া দেওয়া হইল! সুল্‌তান মুবারকের শোণিত-পিপাসা ক্রমেই এত বাড়িয়া চলিল যে দিল্লীর লোক ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। গুজরাটের একজন নিম্নশ্রেণী হিন্দু সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিল। সুলতান তাহার নাম রাখিয়াছিলেন খস্রু খাঁ। চারিদিকে যখন বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা দিল তখন এই প্রিয়পাত্রই সুলতানকে হত্যা করিয়া রাজ অনুগ্রহের প্রতিদান দিল!

সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন তোঘলক

খস্রু খাঁর দিন শেষ হইয়া আসিয়াছল। সুলতান নসিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবা মাত্রই তিনি এতই অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে আরম্ভ করিল। নিজের পথ মুক্ত রাখিবার জন্য তিনি যাহাকে আবশ্যক মনে করিলেন তাহাকেই হত্যা করিলেন। অন্তঃপুরের পবিত্রতা আর রহিল না,

দিল্লীর ম'সজেদে মসজেদে হিন্দুর দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল! কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই নসিরুদ্দীনের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন গাজি মালিক নসিরুদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাজমুকুট ধারণ করিলেন। লোকে মনে করিল—বাঁচিলাম। সকলে তখন নূতন সুলতান গিয়াসউদ্দীন তোঘলক্ শাহের জয় ঘোষণা করিল (১৩২০ খৃঃ অঃ)।

গাজি মালিক সুলতান হইয়াই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উলুঘ খাঁকে ওরঙ্গলে পাঠাইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু মুসলমান সেনা ধাবিত হইল। তখনো ওরঙ্গল-রাজ প্রতাপরুদ্র দেব জীবীত ছিলেন। দিল্লীর রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে তিনি আবার স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ত একবার মালিক কাফুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই দেখিয়াছিলেন মুসলমান শত্রু অর্থ চাহে, আর কিছু চাহে না। এবারও তাই তিনি প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন। কিন্তু উলুঘ খাঁ অর্থ লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন না। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধে প্রথমে উলুঘের পরাজয় ঘটিল বটে, কিন্তু পরিশেষে জয়লক্ষ্মী তাঁহারই কণ্ঠে মাল্যদান

ওরঙ্গলের পতন

করিলেন। বন্দী প্রতাপরুদ্র সপরিবারে দিল্লী নগরে প্রেরিত হইলেন। উলুঘ খাঁ ওরঙ্গল নামটী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া তেলিঙ্গনার নাম রাখিলেন স্থলতানপুর। স্থলতান পুরে তখন মুসলমান শাসন কর্ত্তার প্রতিষ্ঠা হইল (১৩২৩ খৃঃ অঃ)।

দক্ষিণাপথে নবরাজ্যের সূচনা

উলুঘ খাঁ যখন মহম্মদ তোঘলক শাহ নাম লইয়া পিতৃরক্তে রঞ্জিত রাজমুকুট শিরে তুলিয়া লইলেন তখন দক্ষিণাপথের দুইটী প্রবল হিন্দু রাজ্য ওরঙ্গল এবং দেবগিরির পতন ঘটিয়াছে। তখন ওরঙ্গলের নাম হইয়াছে সুলতানপুর এবং দেবগিরির নাম হইয়াছে দৌলতাবাদ। সুলতানপুর ও দৌলতাবাদে তখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা স্থাপিত হইয়াছেন। যদিও ইহার পূর্ব্বে মালিক কাফুর সমস্ত দক্ষিণাপথকে লুণ্ঠনে ও হত্যায় পীড়িত করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নির্ম্মিত মসজেদে তখন বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল কিন্তু দক্ষিণাপথ তখনো হিন্দুরই ছিল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচার তাহাদিগকে তখন একান্ত মুসলমান-বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা তখন সভয়ে দেখিল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুসলমানের জয় পতাকা প্রোথিত হইয়াছে। অর্থলোভী মুসলমান সেনার তাড়নে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিজয়নগর

ভারতের পশ্চিম তীরে বোম্বাই হইতে পূর্ব্বতীরে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে তাহা অর্দ্ধপথে তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ধাবিত হয়। এই তুঙ্গভদ্রা ভারত বিখ্যাত কৃষ্ণা নদীর প্রবল শাখা। এক সময়ে (১৩৩০ খৃঃ অঃ) উহারই উত্তর তীরে আধুনিক বেলারি নামক নগর হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অনেগুন্দি নামক একটী ক্ষুদ্র সুরক্ষিত নগর বর্ত্তমান ছিল। সেই পার্ব্বত্য জনপদের আশ্রয়ে তখন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটী গড়িয়া উঠিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। তুঙ্গভদ্রা তথায় সুগভীর—পদব্রজে অতিক্রম করা অসম্ভব। বর্ষাকালে নদীবেগ এমন ভীষণ যে কুটা পড়িলে ভাসিয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অখ্যাত অনেগুন্দি অনুকূল অবস্থায় যে বিপুল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল তাহার ঐশ্বর্য্যের ও শক্তির কাহিনী—তাহার

অনেগুন্দি

বিস্তৃতি ও শোভার কাহিনা এখন শুনিলে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর ন্যায় অলীক বলিয়া মনে হয়। উত্তরে কৃষ্ণাতীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে সাগর তটে ভাট্‌কল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে সমগ্র উড়িষ্যা একদিন এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গতঃ ছিল। ইহাই ভারতের শেষ বিরাট হিন্দু সাম্রাজ্য।

রাজধানী প্রতিষ্ঠা

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলের পতনের পর ওরঙ্গলপতি বন্দীরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু কয়েক বৎসর পর মুক্তি লাভ করিয়া তিনি যখন স্বদেশে ফিরিলেন, তখন দেখিলেন তাঁহার বড় সাধের রাজধানী বিলুষ্ঠিত হইয়াছে। চারিদিকে কেবল ধ্বংসের প্রেতমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। তাঁহার হৃতগৌরব আর ফিরিল না—যে প্রতিষ্ঠার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল আর তিনি তাহা গঠন করিতে পারিলেন না। প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর প্রতাপরুদ্র দেব তখন সামান্য একজন সেনানায়করূপে বর্ত্তমান রহিলেন। ওরঙ্গল যখন মুসলমানদিগের করকবলিত হইল তখন তাঁহার দুইজন সেনানায়ক—দুইটী ভ্রাতা—বুক্করায় এবং হরিহর—কতিপয় অনুচর সহ পলায়ন করিলেন। ওরঙ্গলের পলায়মান সেনাগণ দিনে

দিনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় অনুচরের অধিপতি ক্রমে একটী বিপুল সেনা কটকের নায়ক হইলেন। সেই সেনা কটক লইয়া উভয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে শেষে মাধবাচার্য্য বিদারণ্য নামক পরম পণ্ডিতের পরামর্শে যে রাজধানী স্থাপিত করিলেন, প্রথমে তাহার নাম হইয়াছিল বিদ্যানগর (১৩৩৬ খৃঃ অঃ)। পরে এই বিদ্যানগরই লোক-বিশ্রুত বিজয় নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ বিজয় নগর দেখিয়া বলিয়াছিলেন—কি সম্পদে, কি শোভায় এমন নগর য়ুরোপে পর্য্যন্ত নাই। এই বিজয়নগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে অধিকার লাভ করিবার জন্য পশ্চিম-ভারতে আগত পর্তুগীজগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বিজয়নগরের পতন হইয়াছিল তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র গোয়ারও পতন ঘটিয়াছিল।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণভারতের হিন্দুরাজগণ দেখিলেন যে মুসলমান শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিজয়নগরপতির আশ্রয় লওয়া ভিন্ন গতি নাই। তাই তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে বিজয়নগর পতিকেই কর্ত্তা

বলিয়া মানিয়া লইলেন। বিজয়নগরের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা অতি দ্রুত বাড়িয়া উঠিল।

দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তোঘলকের শাসনকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল যে সুলতানের সকল শক্তি সেই দিকেই নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিন্ধ্য পর্ব্বতের অন্তরালে দক্ষিণ ভারতে কি যে ঘটিতেছিল, সে দিকে মনোযোগ দিবার অবসর মাত্র সুলতানের ছিল না। তখন সুলতানের অধীনে দক্ষিণ-ভারতে যে রাজ্য গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার শাসনকর্ত্তাগণ আপন আপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন—দূরে পরে কি করিতেছে তাহা দেখিয়া সময়ক্ষেপ করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

এই সুযোগে বুক্করায় এবং হরিহর দক্ষিণাপথের পূর্ব্বভাগে এবং দক্ষিণে নির্ব্বিবাদে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিল না। রাজধানী বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে ধীরে ধীরে গঠিত হইতে লাগিল। যে স্থানে নগরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা প্রকৃতির বিধানে দুর্ভেদ্য ছিল। দুর্গম গিরিমালা ও তুঙ্গভদ্রার প্রবল তরঙ্গ নগরটীকে রক্ষা করিত। মধ্যে

মধ্যে প্রাচীর রচনা করিয়া বিজয়নগরপতি দূরে দূরে অবস্থিত গণ্ডশৈলগুলিকে সংযুক্ত করিলেন।

এইরূপে পর পর সাতটী প্রাচীর বিজয়নগরকে বেষ্টন করায় উহা এরূপভাবে স্বরক্ষিত হইয়াছিল যে নগরের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক ভিন্ন অন্য দিক দিয়া প্রবেশের উপায় ছিল না। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের ভূমি নিম্ন ছিল বলিয়া তথায় প্রায় দুই ক্রোশ পরিমিত দীর্ঘ একটী জলাশয় খনিত হইয়াছিল। সেই জলাশয়ের তীরও একটী প্রাচীরের কার্য্য করিত। এই জলাশয় অতিক্রম করিয়া পুরী আক্রমণ করিবার কোন স্বযোগ ছিল না।

বিজয়নগর

পারস্যের রাজদূত আবদর রজাক বিজয়নগরে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহা সৌভাগ্যে ও সম্পদে অতুল। নৃপতির শক্তিও তথায় অপরিসীম। তাঁহার অধীনে তখন শৈলপ্রমাণ উচ্চ এবং রাক্ষসের ন্যায় বলবান সহস্র হস্তী ও একদশ লক্ষ যোদ্ধ্ পুরুষ বর্ত্তমান ছিল। আবদর রজাক মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে বিজয়নগরের অনুরূপ আর একটী নগর কেহ কখনো দেখে নাই। উহার উত্তর সিংহদ্বার হইতে দক্ষিণ সিংহ দ্বার ৭ মাইল ব্যবধান।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে কর্ষণযোগ্য ভূমি, উদ্যান ও গৃহাদির অভাব ছিল না। তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহু বিপণী ছিল। বিপুল জনমণ্ডলী সেই সকল স্থানে বাস করিত। বাজারে বাজারে উচ্চ বেদী এবং সুদৃশ্য সোপানশ্রেণী বর্ত্তমান ছিল।

সেকালে ফুলের বাজারে দিবা নিশি ফুল বিক্রীত হইত। বিজয়নগরের লোক মনে করিত খাদ্যের ন্যায় গোলাপ ফুলেরও নিত্য প্রয়োজন। তথায় বিপণী পরিপূর্ণ মণিমুক্তা সূর্য্য করে ঝক্ ঝক্ করিত—নানাস্থানে হীরক ও প্রবাল বিক্রীত হইত।

রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই প্রস্তর নির্ম্মিত পয়ঃনালী দিয়া খরবেগে জল বহিয়া যাইত। পয়ঃনালীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই অতি বৃহৎ দেওয়ানখানা। এইখানে রাজমন্ত্রী বসিতেন। এই বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া একজন রাজপুরুষ শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সেই মঞ্চের পদতলে সারি বাঁধিয়া চোপদারগণ দাঁড়াইত। বিচার কার্য্য শেষ করিয়া এই কর্ম্মচারী যখন রাজদর্শনে যাইতেন তখন ছত্রধারিগণ সুচিত্রিত সাতটী ছত্র লইয়া

তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত—অমনি নহবৎ বাজিয়া উঠিত—স্তাবকগণ সারি বাঁধিয়া তাঁহার জয় গাহিত।

মুদ্রা প্রস্তুত করা চিরদিনই স্বাধীনতা ঘোষণার অন্যতম উপায় বলিয়া পরিচিত। বিজয় নগরেও:সেকালে তিন প্রকার স্বুবর্ণ, এক প্রকার রৌপ্য এবং এক প্রকার তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হইত। রাজপ্রাসাদের বামভাগে এই টঙ্কশালা অবস্থিত ছিল।

নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে পারস্য দূত আবদর রজাক দেখিয়াছিলেন যে কি বড়, কি ছোট—বিজয় নগরে সকলেই মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত ভূষণ ব্যবহার করিত। নৃপতি যখন রাজসভায় আসিতেন তথন বহুমূল্য মুক্তার হার তাঁহার কণ্ঠে দুলিত। সে হারের মূল্য নিরূপণ করা মণিকারদিগের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত রাজসিংহাসন বেড়িয়া সারির পর সারি মুক্তার হার গ্রথিত থাকিত। সে সিংহাসন দেখিয়া পারস্যের রাজদূত বলিয়াছিলেন—এমন শিল্প নৈপুণ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

উৎসবকালে যখন মুক্ত প্রান্তরে গৃহাদি নির্ম্মিত হইত তখন মনে হইত সহসা যেন একটা নূতন নগর দেখা দিয়াছে। সে নগরের গৃহগুলি ত্রিতল, চতুস্তল, পঞ্চতল।

তাহাদের প্রত্যেকের গাত্রে অসংখ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। সে সকল চিত্র এতই সুন্দর ছিল যে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হইত। কোন কোন গৃহ আবার এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইত যে অনবরত বৃত্তাকারে ঘূরিত এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্যাবলী প্রকাশ করিয়া নয়ন সমক্ষে ধরিত! এই উৎসব ক্ষেত্রে নৃপতির জন্য একটী নবতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইত এবং রাজা তাহারই সর্ব্বোচ্চস্থানে বহুমূল্য প্রস্তরাদিতে খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেসন করিতেন। রাজা যে প্রাসাদে বাস করিতেন তাহার প্রাচীর তরবারির পৃষ্ঠের ন্যায় পুরু সোণার পাতে মণ্ডিত ছিল। সেই সোণার পাত আবার নানাবিধ মুক্তাদিতে খচিত ছিল। মুক্তাখচিত এই সোণার পাত সুবর্ণের শলাকা দ্বারা কক্ষ প্রাচীরগাত্রে আবদ্ধ থাকিত।

বিজয়নগরের বল

প্রাচীনকালে বিজয়নগর রাজ্যে যে সকল বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইত তাহাদের মধ্যে দীপালী, মহানবমী এবং হোলী প্রধান ছিল। এই সকল উৎসব যেরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত তাহা দেখিয়া বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের শক্তি

ও সমৃদ্ধির পরিচয় এই সকল উৎসবের সময়েই বেশ বুঝিতে পারা যাইত। প্রতিবৎসর মহানবমীর উৎসবান্তে বিজয়নগরপতির সেনা সুসজ্জিত হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইত। নানা বর্ণের রেশমে নির্ম্মিত রশ্মি ও নানাবিধ ভূষণ অশ্বদিগের শোভা বর্দ্ধন করিত। অশ্বারোহিগণ নানা রত্নভূষণে সজ্জিত হইয়া যখন কুঠার ও কার্ম্মুক লইয়া আপন আপন অশ্বে আরূঢ় থাকিত, তখন সে দৃশ্য দেখিলে সকলেরই হৃদয় বিস্ময়ে ও গর্ব্বে পূর্ণ হইয়া যাইত। অশ্বের পর হস্তী দাঁড়াইত। সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ ভল্ল লইয়া বীর যোধগণ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিত। তাহাদের পরই পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পদাতিকের শ্রেণী শোভা পাইত। তাহাদের সোণার ফুলে সজ্জিত ঢাল ও তীক্ষ্ণ তরবারি রবির করে ঝক্ মক্ করিত। সোণার ও রূপার পাতে মণ্ডিত ধনুক লইয়া, কটিতে কুঠার ও পৃষ্ঠে তূণ পূর্ণ বাণ লইয়া যখন ধনুর্দ্ধরগণ জয় নিনাদ করিত, তখন মনে হইত বিজয়নগরের শক্তি অসামান্য। সে কালে যে শুধু তীর ধনুকেই যুদ্ধ হইত তাহা নহে—বিজয়নগরপতির কামান ও বন্দুকও ছিল। সেকালে বিজয়নগর রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক খণ্ডের রাজা বা শাসনকর্ত্তা সেনা রক্ষা করিতেন এবং আবশ্যক হইলেই সাম্রাজ্যের কার্য্যের

জন্য তাহারা প্রেরিত হইত। এই জন্যই বিজয়নগরপতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ সেনা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে বিজয়নগরে নারীসেনারও অভাব ছিল না!

বিজয় নগরের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এত অধিক ছিল যে এখন শুনিলে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণ বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ দেখিয়া বিস্ময়ে মূক হইয়াছিলেন। কোন কক্ষের অভ্যন্তর হস্তী দন্তে নির্ম্মিত অসংখ্য পুষ্পে সুশোভিত, কাহারও প্রাচীর সোনার পাতে মণ্ডিত, কোন কক্ষের ছাদ হইতে বহুমূল্য হীরকরাজি বিলম্বিত ছিল! নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রে কোন কোন কক্ষ সুশোভিত ছিল। কোন কক্ষের প্রাচীরগাত্রে মনুষ্যের জীবনকাহিনী চিত্রে লিখিত হইয়াছিল। এখানে নৃত্যশালা —তাহার স্তম্ভে স্তম্ভে নৃত্যের নানা ভঙ্গী পাথর কাটিয়া রচিত, সেখানে বিচার মণ্ডপ. স্থানান্তরে শান্তিরক্ষকদিগের দপ্তর--কোথাও বা দেব মন্দির, এইরূপ নানা অট্টালিকায় সেকালে বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত ছিল। বিজয়নগরের সে সকল রাজ-অট্টালিকা, দেবমন্দির,—সে সকল বিরাট সিংহদ্বার, সে নৃত্যশালা এখন ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও, হাম্পির প্রান্তরে তাহাদের যে দুই চারিটী নিদর্শণ দেখিতে

বিজয় নগরের সমৃদ্ধি

পাওয়া যায়, উহারাই সেকালের স্থাপত্যবিদ্যার গৌরব ঘোষণা করে। সে দেওয়ানখানা, সে বিরুপাক্ষ মন্দির—বিটলস্বামীর মন্দিরের সে অভ্যন্তর ভাগ—বিটলস্বামীর মন্দিরের পুরোভাগে স্থাপিত নানা কারুকার্য্যে শোভিত প্রস্তরে নির্ম্মিত রথ, সে হস্তীশালা নগর প্রভৃতির অবশেষ দেখিয়া এখনো লোকে বিস্ময় প্রকাশ করে।

বিজয়নগরে কৃষি ও বাণিজ্য

কৃষি এবং বাণিজ্যই বিজয়নগরকে এত সমৃদ্ধি দিয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশের বণিক বিজয়নগরে বাস করিত—এবং তথা হইতে ভারতের বহুমূল্য হীরক, মণি, মুক্তা ও অন্যান্য পণ্য লইয়া যাইত। কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য বিজয়নগরপতিগণ সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রস্তরের পয়ঃ নালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই সাহায্যে বহু দূর স্থান হইতে জল আনিয়া দিতেন। পর্ত্তুগীজ পাইস্ বলিয়া গিয়াছেন যে বিজয়নগরে কখনো খাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না। ধান্য, গম, কলাই, প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল ও ফুল, নানা প্রকারের পক্ষী সর্ব্বদা বিজয়নগরে অতি সুলভে পাওয়া যাইত। বিজয়নগরের উপকণ্ঠে যথেষ্ট গো মহিষ ও মেষ পাওয়া যাইত। এক একটী মেষ এমন ছিল যে বালকগণ উহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিত।

ধনে জনে, মন্দিরে প্রাসাদে যে রাজনগর একদিন পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত ছিল—যে রাজ্যের অমিত বিক্রমে দক্ষিণাপথ দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানের গতিরোধ করিয়া হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, সে রাজনগরও একদিন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিজিত হইয়াছিল—সে রাজ্যও একটী মাত্র যুদ্ধে এরূপ ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল যে আর উঠিতে পারিল না। বিজয়নগরের নৃপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুর্ব্বলচেতা ছিলেন বটে—কিন্তু তথায় দ্বিতীয় দেবরায় বা কৃষ্ণ রায়ের ন্যায় রাজাও ছিলেন।

দ্বিতীয় দেবরায় ও সুলতান ফিরোজ শাহ

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দেবরায় (১৪১৯ খৃঃ অঃ) দেখিলেন বাহ্মণী সুলতান ফিরোজ সার লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া ওরঙ্গল অধিকার করিতে চাহিতেছেন। যুবক দেবরায় যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতান ফিরোজ প্রমাদ গণিলেন। এমন আত্মত্যাগ এমন নির্ভিকতা—এমন করিয়া শমনকে বরণ তিনি আর কখনো দেখেন নাই।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিন্দুগণ জীবন ও স্বাধীনতার জন্য, আর সুলতান পররাজ্য গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধিলাভের জন্য যুদ্ধারম্ভ করিলেন। দেবরায়ের সেনাগণ

মত্ত ভৈরবের মত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। হিন্দুসেনা সেই পলায়নমান মুসলমান সেনাদিগকে তাড়না করিল—সুলতান জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। জয়দৃপ্ত হিন্দু সেনা সুলতানের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইল—ধর্ম্মমন্দির ভূমিসাৎ করিল—অনল সংযোগে গৃহাদি ভস্মীভূত করিল।

কিছুকাল পর সমর কোলাহল যখন নীরব হইল তখন সুলতান ফিরোজ অবসন্ন দেহে শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা তখন বিদ্রোহী হইয়া বাহ্‌মনী রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনলাভ করিয়াই সুলতান আহম্মদ শাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। তখন দক্ষিণাত্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনেও হিন্দু সেনা প্রাণপণে যুঝিল। জয়ের আশা না দেখিয়া দেবরায় সন্ধি করিলেন। সুলতান আহম্মদ শাহ ওরঙ্গল অধিকার লইলেন। ওরঙ্গলের হিন্দুরাজ্য সেইদিন হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।

বিজয়নগর বহুমূল্যে যে সন্ধি ক্রয় করিয়াছিল তাহা দশ বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিল। কিন্তু দ্বিতীয়

আলাউদ্দীন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন। দেবরায় দেখিলেন হিন্দুসেনাদিগকে সুশিক্ষিত ও সুগঠিত না করিয়া যুদ্ধ করা বৃথা। তিনি সন্ধি করিলেন। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে ও পীড়নে হিন্দুজনপদ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল! দেবরায় ক্ষুব্ধচিত্তে প্রধান প্রধান হিন্দু বীরদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মন্ত্রণা-সভা করিলেন। সেই সভায় নির্দ্ধারিত হইল যে সুলতানের অশ্বারোহিগণ অধিক কর্ম্মঠ এবং তাঁহার তীরন্দাজগণ অব্যর্থ-সন্ধান বলিয়াই তাঁহার জয় হইয়াছে। দেবরায় তখন মুসলমান সেনা লইয়া রাজসৈন্য গঠন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জায়গীর দিয়া তুষ্ট করিলেন এবং উপাসনার জন্য মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় উদার ছিল। তিনি সেই উদারতার পরিচয় দিয়া রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ রক্ষা করিলেন। মুসলমানগণ দেখিল দেবরায় অপক্ষপাতে বিচার করিতেছেন। তাহারা পুলকিত হইয়া তাঁহার জয় কামনা করিতে লাগিল। শিক্ষিত মুসলমান সেনার সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুসেনা যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিল।

দেবরায়ের সৈন্যসংগঠন

দেবরায়ের সেনাগণ যখন ক্রমে শিক্ষালাভ করিতে

লাগিল, সেই সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। দেবরায়ের ভ্রাতা কতকগুলি প্রধান ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া অবশেষে দেবরায়ের কণ্ঠ কাটিবার আয়োজন করিলেন। বাহ্‌মনি স্থলতান এই গোলযোগের স্থযোগে পুনরায় দেবরায়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুই মাসের মধ্যে মুদকলের নিকট তিনটা ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল। উভয় পক্ষের বহু সেনা নিহত হইল—বহু বীর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। দেবরায়ের অকুতোভয় বীরপুত্রও শত্রু-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখনকার মত আবার যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহা দেবরায়ের জীবনকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল।

মুদকলে যুদ্ধ

দেবরায় যে শুধু সংগ্রাম লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মসজেদ ও জৈন মন্দির এবং হিন্দু দেবায়তন ও বিদ্যাপীঠ রচনা করিয়া বিজয় নগরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রস্তর কঙ্করময় অনেক ক্ষেত্র তাঁহার যত্নে ক্রমে সরস হইয়াছিল। ফল ফুলের স্থন্দর স্থন্দর উদ্যান রচিত হইয়া তখন বিজয়নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।

বিজয়নগর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও রাজহত্যা এবং শলুভ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

নানা স্থানের লোক আসিয়া সে সময়ে বিজয়নগরে ও তাহার উপকণ্ঠে বাস করিতে আরম্ভ করিল। বিজয়নগর ধনে ও জনে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিল। দেবরায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যে আবার ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সিংহাসনের লোভে যে যখন পারিল রাজাকে হত্যা করিতে লাগিল। এইরূপে ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যায় বিজয়নগর কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাজা বিরুপাক্ষের ন্যায় অত্যাচারী, নির্দ্দয় ও চরিত্রহীন হইলেন। দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ তখন মিলিত হইয়া দেবরায়ের বংশকে বিদূরিত করিয়া তাঁহাদেরই মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তির শিরে রাজমুকুট স্থাপিত করিলেন। বিজয়নগরের এই দ্বিতীয় রাজবংশ শলুভ বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই বিজয়নগর রাজ্যের শেষের আরম্ভ। (১৫০৯খ্রীঃ অঃ)।

যে সুযোগে দক্ষিণাপথে পরাক্রান্ত মুসলমান বাহ্‌মনি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সুযোগেই দক্ষিণাপথে হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা। উভয় রাজ্যই বলিতে গেলে একই সময়ে জন্মলাভ করিয়া দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত

গৌরবে ও সম্ভ্রমে দক্ষিণাপথে বিরাজ করিয়াছিল।

শলুভ রাজবংশ

আবার প্রায় একই সময়ে উভয় রাজ্যের অন্তরে পাপ ও হিংসাপ্রবেশ করায় উভয় রাজ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বাহ্‌মনি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যখন পাঁচটী নবীন রাজ্য গঠিত হইল, প্রায় সেই সময়েই বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশ উৎখাত হইয়া শলুভ বংশের শিরে রাজমুকুট উঠিল।

শলুভ রাজবংশের প্রধান রাজা কৃষ্ণদেব রায়। তিনি সর্ব্বপ্রকারেই রাজনামের পরিচয় রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ ছিল—হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত

কৃষ্ণ দেবরায়

ছিল। যুদ্ধে, অশ্বারোহণে, অসিচালনে, মল্ল ক্রীড়ায়, এবং রাজনীতিতে তাঁহার স্থান সে কালের রাজন্য সমাজের মধ্যে অনেক উচ্চে ছিল। তাঁহার দয়া ও মৃদু স্বভাব সেকালে বিজয়নগরের গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইত। পর্ত্তুগীজ পাইস্ বলিয়া গিয়াছেন যে, কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্র কোনো দিকেই অপূর্ণ ছিল না। শুনিতে পাওয়া যায়, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে অসাধারণ জয়লাভ করিয়া তিনি কিছু উদ্ধত প্রকৃতির হইয়াছিলেন! বিজাপুরপতি আদিল শাহকে পরাভূত করিয়া তিনি কহিয়াছিলেন যে, বিজাপুরপতি

আদিল শাহ তাঁহার চরণ চুম্বন না করিলে তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না! কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্রে এই দম্ভই একমাত্র কলঙ্ক-লাঞ্ছন। তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরগণের এইরূপ দাম্ভিকতা চল্লিশ বর্ষ মধ্যেই বিজয়নগরকে হৃতসর্ব্বস্ব ও শ্মশান করিয়াছিল।

কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে বিজয়নগর বাণিজ্যের জন্য প্রখ্যাত হইয়াছিল। পশ্চিম সমুদ্র তীরে ভাটকল্ নামক বন্দর হইতে লৌহ, নানাবিধ মশল্লা ও ওষধি এবং গন্ধ দ্রব্য দূর দূরান্তরে রপ্তানী হইত এবং আরবদেশের সুন্দর অশ্ব ও নানা স্থানের মুক্তা তথায় যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইত। সুদূর অর্মাজ, পেগু এবং সিংহলের মুক্তা, বিজয়নগর রাজ্যের খণি হইতে সংগৃহীত হীরক, রেসমী বস্ত্র, প্রবাল ও রক্তবর্ণ বস্ত্রাদি এই সময়ে বিজয়নগরের প্রধান পণ্য ছিল। সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্য কৃষ্ণদেব রায়ের আশ্রয়ে অনেকাংশে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজসভায় সেকালে ৮ জন বিখ্যাত কবি থাকিতেন। তাঁহার অগণিত সেনা তখন দিকে দিকে ধাবিত হইয়া বিজয়নগরের জন্য নব রাজ্য জয় করিত। তাঁহার রাজত্বকালেই পূর্ব্ব দিকে কটক হইতে পশ্চিমে সল্‌সেটি পর্য্যন্ত বিজয়নগর রাজ্যের বিস্তৃতি

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি

ঘটিয়াছিল। সুদৃঢ় দুর্গ শিবসমুদ্র এবং শ্রীরঙ্গপত্তন অনায়াসে তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। নেলোর জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি জয় করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, একদিন বহু সমারোহে কৃষ্ণস্বামীর নবনির্ম্মিত মন্দিরে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বিজয় নগরের সম্বন্ধ

পর্ত্তুগালের রাজা জন ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ধনরত্নের কথা শুনিয়া দেশ হইতে জাহাজ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোবাসনা পূর্ণ না হইতেই কাল তাঁহাকে সরাইয়া লইল। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ম্যানুয়েল ভুবন বিখ্যাত ভাস্ক ডা গামাকে প্রেরণ করিয়া তখন পর্য্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপের পরিচয় ঘটাইয়াছিলেন। তাহার পর একে একে, দুইয়ে দুইয়ে পর্ত্তুগীজগণ ভারতে আসিয়া কালিকাটে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই বাণিজ্যের কারণেই শেষে কালিকাটের রাজার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধও হইয়াছিলে। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌মিদা পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা স্বরূপ ভারতে আসিয়া বিজয় নগরের প্রধান বন্দর, ভাটক'লে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর কৃষ্ণরায় কালিকাটে পর্ত্তুগীজদিগের

ব্যবহার দেখিয়া সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ক্রমেই যখন কালিকাটের জামোরিণ ও মুসলমান বণিক-দিগের সঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের শত্রুতা প্রবল হইতে লাগিল, তখন চতুর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা আল্‌বুকার্ক বিজয়নগরের আশ্রয় চাহিলেন এবং কহিলেন কালিকাটের শত্রু দমন করিয়াই পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিনাপথ-বিজয়ে কৃষ্ণরায়ের সাহায্য করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বিজয়নগরপতির সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাহ্মণী সাম্রাজ্য

দিল্লীর খেয়ালী সুলতান মহম্মদ তোগলক দেখিলেন যে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সাম্রজ্য গঠন করিতে হইলে সুদূর দিল্লীতে থাকিয়া তাহা চলে না। ক্রম বর্দ্ধমান হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের উপর খরদৃষ্টি রাখিতে হইলেও দিল্লীতে বাস করা উচিত নহে। তাই তিনি একদিন আদেশ দিলেন যে রাজধানী দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে দৌলতবাদে পরিবর্ত্তিত হইল। সুলতানের আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ স্তম্ভিত হইল। সুলতান কাহাকেও কালবিলম্ব করিতে দিলেন না। যে নগর ১৮০ বৎসর ধরিয়া মুসলমানের জয় গৌরব ও সুখস্মৃতি বহন করিতেছিল, প্রজাগণ যেখানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্তে বাস করিতেছিল—সুলতানের আদেশে একমুহূর্ত্তে তাহা ছাড়িতে হইল। শূন্যগৃহ পড়িয়া রহিল, অর্দ্ধকর্ষিত শস্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিল,

দৌলতাবাদে রাজধাণীগঠমের চেষ্টা



সুলতানের আদেশে সকলকেই দৌলতাবাদে যাত্রা করিতে হইল।

পৃ—১১৩।

জনপূর্ণ সরাই ও কোলাহলমুখর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ নীরব হইয়া গেল। দিল্লীর রাজপথে একটা কুকুর বিড়াল পর্য্যন্তও আর দেখা গেল না। সুলতানের আদেশে সকলকেই দৌলতাবাদে যাত্রা করিতে হইল। সুলতান ভাবিয়াছিলেন, এক দিনেই দৌলতাবাদকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজনগরীরূপে গঠন করিবেন! যাহারা স্বেচ্ছায় যাত্রা করিল, তাহারা শুধু চোখের জল মুছিতে মুছিতে স্ত্রী পুত্র লইয়া সেই অজানিত দুর্গম পথ বহিয়া চলিতে পাইল। যাহারা যাইতে চাহিল না—তাহাদের লাঞ্ছনা ও পীড়ার অভাবত রহিলই না—শেষে দৌলতাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিতেও হইল! কত পান্থ দারুণ পথশ্রমে পথেই মরিয়া গেল, আর কত বা ক্ষত বিক্ষত চরণে শীর্ণ ক্লিষ্ট ভগ্নদেহে কোনরূপে দৌলতাবাদে উপস্থিত হইয়া মনো-দুঃখে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গে, অনশনে এবং বৃক্ষতলেই মরিতে আরম্ভ করিল। হিন্দুর রাজনগর দেবগিরি বা মুসলমানের দৌলতাবাদে তখন রাশি রাশি সমাধিস্তম্ভ প্রোথিত হইয়া সুলতান মহম্মদ তোঘলকের উন্মত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল! সুলতান কহিলেন—‘আর কাহারও এখানে থাকিয়া কাজ নাই। আবার দিল্লীতে ফিরিয়া চল। এতদিনও যাহারা দৌলতাবাদে জীবিত ছিল তাহারা

আবার পদব্রজে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। এই সকল গৃহতাড়িত পথিকদিগের মধ্যে হাসন নামে এমন একজন লোক ছিলেন যিনি এক সময়ে দাক্ষিনাত্যে একটী বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে একটী দরিদ্রের গৃহে হাসনের জন্ম হইয়াছিল। জন্মের পর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত হাসন সামান্য একজন কৃষক ভিন্ন আর কিছু ছিলেন না। গঙ্গু নামক দিল্লীর একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হাসনকে নিজ বেতনভোগী কৃষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদৃষ্টলক্ষ্মী কৃপা করিলে পথের ধূলাও সোণার রেণু হয়। হাসনেরও তাহাই হইয়াছিল। একদিন হলকর্ষণ করিতে করিতে হাসন দেখিলেন মাটীর নীচে অনেক অর্থ আছে। ইচ্ছা করিলেই হাসন উহা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ নীচ ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সে সমুদয় অর্থ লইয়া তাঁহার প্রভু ব্রাহ্মণ গঙ্গুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ হাসনের সততা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে সুলতান মহম্মদ তোঘলকের নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হাসন গঙ্গু

সুলতান হাসনের সাধু ব্যবহারে প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ



হলাকর্ষণ করিতে করিতে হাসন দেখিলেন মাটীর নীচে অনেক অর্থ আছে।

দক্ষিণাপথ পৃ—১১৪।

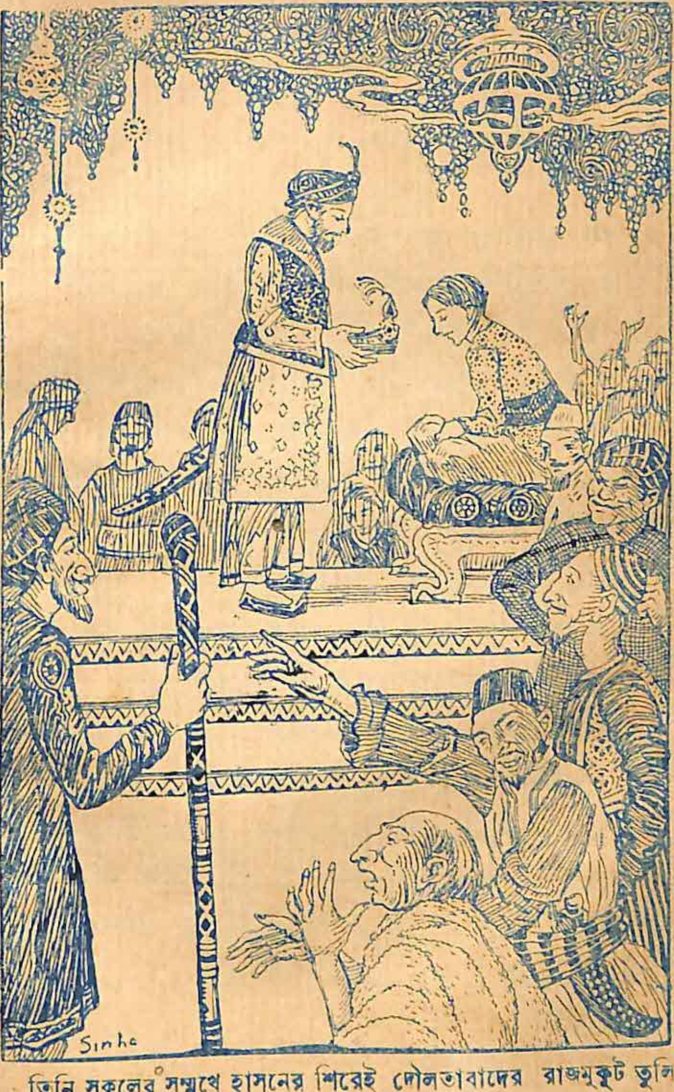
তাঁহাকে একশত অশ্বারোহী যোদ্ধার নায়কের পদ অর্পণ করিলেন। কৃষক হাসন সহসা সেনানায়ক হাসন হইলেন। ব্রাহ্মণ গঙ্গু হাসনের কোষ্ঠি লিখিয়া দেখিলেন যে তিনি রাজা হইবেন। ব্রাহ্মণ পরমানন্দে হাসনকে সে সংবাদ দিয়া কহিলেন—'তুমি রাজা হইয়া এ দীন ব্রাহ্মণকে ভুলিও না। আমাকেই তোমার মন্ত্রীত্ব দিও।" শুনিতে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ সাধু শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়াও হাসন সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন।

স্থলতান মহম্মদ তোঘলক যখন দৌলতাবাদে নবীন রাজধানী গঠন করিবার চেষ্টা করেন সেই সময়ে তিনি কুতলু খাঁ নামক একজন পাঠানকে দৌলতাবাদের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। হাসন কতলুখাঁর অধীনে কর্ম্মচারীস্বরূপ দৌলতাবাদে আসিলেন। দৌলতাবাদে আসিলে পর কতলু খাঁ হাসনকে জায়গীর স্বরূপ গুলবর্গে একটু ক্ষুদ্র নগর দান করিলেন। দরিদ্র কৃষক হাসন ভূস্বামী হইলেন এবং দিনে দিনে, নিজ শক্তি ও সম্পদ বাড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর ওরঙ্গলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান মহম্মদ

তোঘলকের ভীষণ অত্যাচারে সকলেই অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। ওরঙ্গলের হিন্দুগণও তাই তথাকার মুসলমান আমীর ওমরাহদিগকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করিতে আসিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরই দিল্লীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল সুলতান সকল কর্ত্তব্যভার ইমাদ্-উল্-মুলক্ নামক একজন প্রধান কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিয়া ত্বরায় দিল্লীতে ফিরিলেন।

ওরঙ্গলে বিদ্রোহীদিগের নেতা আমির ওমরাহদিকে ধরিবার জন্য সুলতানের আদেশে ইমাদ্-উল্-মুসক্ সসৈন্যে গুলবর্গে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিবার জন্য হাসন গঙ্গু প্রস্তুত ছিলেন। ওরঙ্গল হইতেও বহু সেনা আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। দৌলতাবাদের সুলতানও এই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন। হাসনকে সাহায্য করিবার জন্য তিনিও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সেনা পাঠাইলেন। এইরূপে বল সঞ্চয় করিয়া হাসন, ইমাদ্-উল্-মুলকের সহিত যে যুদ্ধ করিলেন তাহাতে তাঁহারই জয় হইল। ইমাদ্-উল্-মুলকের ছত্রভঙ্গ সেনা, যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল— কতক বা হাসনের অধীনে কর্ম্ম লইল। বিদরের;



তিনি সকলের সম্মুখে হাসনের শিরেই দৌলতাবাদের রাজমুকুট তুলিয়া দিলেন।

দক্ষিণাপথ পৃ—১১৭।

সমরক্ষেত্র ইমাদ্-উল্-মুলকের রুধিরে রঞ্জিত হইল। দিল্লীর সুলতান তখন তাঁহার নিজ গৃহ রক্ষা করিতেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে হাসনকে শাসন করিবার অবসর পাইলেন না।

হাসন দেখিলেন তাঁহার তখন বহু পদাতিক, বহু অশ্বারোহী, বহু অর্থ। তিনি আরও দেখিলেন যে সেনাগণ সকলেই তাঁহার জয় কামনা করিতেছে। দৌলতাবাদ আক্রমণ করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। তথাকার বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া কোন ফল হইবে না, কারণ লোকে তখন চায় যৌবনের নববলে দৃপ্ত অসমসাহসিক নেতা, তাহারা আর বৃদ্ধকে চাহে না। তিনি তখন সকলের সম্মুখে হাসনের শিরেই দৌলতাবাদের রাজমুকুট তুলিয়া দিলেন। বলিলেন— আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করাই আমার উচিত। (১৩৪৭ খৃঃ অঃ)

নব গৌরব লাভে গর্ব্বিত কৃষক হাসন এইরূপে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুরাতন প্রভুকে স্মরণ করিলেন এবং তাঁহাকেই এই নবীন সাম্রাজ্যের আয় ব্যয় ও কোষাগারের কর্ত্তা করিয়া দিলেন। প্রভুর নাম চির স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি নিজের নাম রাখিলেন—

সুল্তান আলাউদ্দীন হাসন গঙ্গু বাহ্মনী। তাঁহার সাম্রাজ্য বাহ্মনী-রাজ্য নামে ইতিহাসে পরিচিত।

এক সময়ে আলাউদ্দীন এবং মহম্মদ তোঘলক হিন্দু রাজাদিগের নিকট হইতে দক্ষিণাপথের যে সকল অংশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই নবগঠিত বাহ্মনী রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল। ক্রমে বেরারের অন্তর্গত এলিচপুর হইতে কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা তীর পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে আরব সাগর হইতে মহুর, রামগির ও ইন্দোর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ বাহ্মনী রাজ্যের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে হিন্দু রাজ্য ওরঙ্গল, বাহ্মনী রাজ্যকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেয় নাই। কৃষ্ণার দক্ষিণে বিজয়নগর আড়াই শত বৎসরের জন্য দক্ষিণাপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মহম্মদ তোঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লীর সুলতান হইয়া যখন দেখিলেন যে বাহ্মনী রাজ্যের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়—উহা জনগণের হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি বুদ্ধিমানের মত উহাকে মানিয়া লইলেন। হাসন গঙ্গু নির্ব্বিবাদে নব রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন। সামান্য একজন কৃষক এত বড় একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন

বাহ্মনী রাজ্যের বিস্তৃতি

এবং দয়া দাক্ষিণ্য ও অপক্ষপাতিত্বে এমন করিয়া প্রজার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন যে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও হাসন গঙ্গু অপরূপ চরিত্র মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে অবিচার করিতে দেখে নাই—কেহ তাঁহাকে নৃশংস হইতে দেখে নাই। রাজা হইয়া তিনি রাজগুণেরই আধার হইয়াছিলেন। তিনি যখন বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, বৈদ্যদিগের সাধ্য নাই যে তাঁহারা আর রক্ষা করিতে পারেন—তখন তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভীমা তীরে তাঁহার বড় সাধের রাজধানী কুল্‌বর্গকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী নগরী বা 'আশনাবাদ' বলিয়া মনে করিতেন। সাম্রাজ্যকে ৪টী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক একজন বিশ্বাসী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া তিনি নিজে বিলাস ব্যসন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। রাজ্যের মঙ্গল চিন্তায় তাঁহার দিন কাটিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রদিগকে নানা উপদেশ দিয়া হাসন গঙ্গু ১৩৫৯ খৃঃ অব্দে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

হাসন গঙ্গুর শেষ সময়

হাসন গঙ্গুর পুত্র মহম্মদ পিতার রাজগুণ পান নাই। তিনি সুল্‌তান হইবা মাত্রই বিজয়নগর এবং ওরঙ্গলের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত বাহ্‌মনী সুল্‌তানদিগকে বিব্রত রাখিয়াছিল। যুদ্ধে তাঁহারা কখনো জয়, কখনো বা পরাজয় লাভ করিতেন। আড়ম্বরপ্রিয় মহম্মদ রাজনগরীকে সুসজ্জিত করিলেন, আমির ওমরাহের পুত্রদিগকে বাছিয়া লইয়া তাঁহার দেহরক্ষী সেনা দল গড়িলেন। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সেনা এবং এক সহস্র দেহরক্ষী প্রত্যহ তাঁহার সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিত, প্রতিদিন তথায় পাঁচবার করিয়া নঃবত বাজিত।

সুলতান মহম্মদ

সুল্‌তান মহম্মদ সতর্ক প্রহরীর মত তাঁহার রাজমর্য্যাদাকে রক্ষা করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত, এই বুঝি উহাতে আঘাত লাগিল! চিত্তের এই দুর্ব্বলতার জন্য দুইবার তাঁহাকে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। একবার কয়েকজন অশ্ব বিক্রেতা তাঁহার রাজধানীতে কতকগুলি অশ্ব আনিল। অশ্ব দেখিয়া সুলতান বলিলেন—'এই সকল দুর্ব্বল কুৎসিত ঘোড়া তোমরা সুল্‌তানের জন্য আনিয়াছ?' অশ্ব

তেলিঙ্গনার সহিত সুল্‌তান মহম্মদের যুদ্ধ

বিক্রেতা যুক্ত করে কহিল—“না, জাঁহাপনা। ওরঙ্গলের যুবরাজ নাগদেব ভালো ঘোড়াগুলি লইয়াছেন।” সুলতান তখনই কুপিত হইয়া কহিলেন—“কি বিধর্ম্মী নাগদেবের এতদূর স্পর্দ্ধা!” অমনি সাজ সাজ রব উঠিল। কাড়া নাকড়া, ও ডঙ্কা বাজিল। সুল্‌তান মহম্মদ বহু সেনা লইয়া তেলিঙ্গনা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধের পর তেলিঙ্গনার রাজকুমারকে বন্দী করিয়া আনা হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে এই রাজবন্দীর মুখে গর্ব্বিত উক্তি শুনিয়া সুল্‌তান মহম্মদ আদেশ দিলেন—“দূরে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড রচনা কর এবং এমন একটী কল বসাও যে বন্দীকে তাঁহারই সাহায্যে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়।” আদেশ মাত্রেই তাহা প্রতিপালিত হইয়া গেল। হিন্দুগণ এই নৃশংসতাকে ক্ষমা করিল না। যে চারি সহস্র অশ্বারোহী তেলিঙ্গনায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহারা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুকর্ত্তৃক নিহত হইল। তাহাদের পট্টবাস, আহার্য্য ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠিত হইয়া গেল! পলায়মান মুসলমান সেনা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাত্র দেড় হাজার অশ্বারোহী সেনা জীবিত রহিয়াছে। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য

সুল্‌তান মহম্মদ পুনরায় বিপুলবাহিনী লইয়া তেলিঙ্গনা আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া খণ্ড যুদ্ধ চলিল। অবশেষে সুল্‌তান সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই সন্ধির ফলে হীরকখণির আধার গোলকুণ্ডা বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল! মণি-মুক্তা-খচিত ওরঙ্গলের বহু মূল্য ফিরোজ-সিংহাসন এই সময়ে সুল্‌তান তেলিঙ্গনা হইতে আনিয়াছিলেন। যেদিন উহা গুল্‌বর্গে স্থাপিত হইল, সেদিন রাজনগরে একটা উৎসব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

বিজয় নগরের সহিত সুল্‌তান মহম্মদের যুদ্ধ

যুদ্ধে জয় ও ফিরোজসিংহাসন লাভ করিয়া যখন গুল্‌বর্গে উৎসবের আনন্দ চলিতেছিল সেই সময়ে দিল্লী হইতে এক সহস্র গায়ক ও গায়িকা আনা হইয়াছিল। সে দিন রাজপ্রাসাদ আলোক মালায় সজ্জিত হইয়াছে, সুকণ্ঠে মধুর গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছে, সুরার প্রসাদে সুল্‌তান মহম্মদ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছেন—এমন সময় মন্ত্রিদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—'ইহাদের গানে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখনই বিজয় নগরের রাজার উপর পর্‌ওয়ানা পাঠাও। তিনি উহাদিগকে বখশিস করিবেন!'

আজ্ঞা মাত্রেই মন্ত্রী আদেশ পত্র লিখিলেন, কিন্তু উহা

প্রেরণ করা হইল না। তিনি ভাবিলেন সুরায় বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াই সুল্‌তান এরূপ আদেশ দিয়াছেন। নতুবা যে রাজ্য স্বাধীন ও প্রবল পরাক্রান্ত, তাহার রাজার উপর এমন আদেশ-পত্রও কি কেহ পাঠাইতে পারে?

পরদিন সুলতান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আদেশ-পত্র পাঠাইয়াছ?"

"না জাঁহাপনা!"

"কেন?"

"বিজয় নগর যে স্বাধীন রাজ্য।"

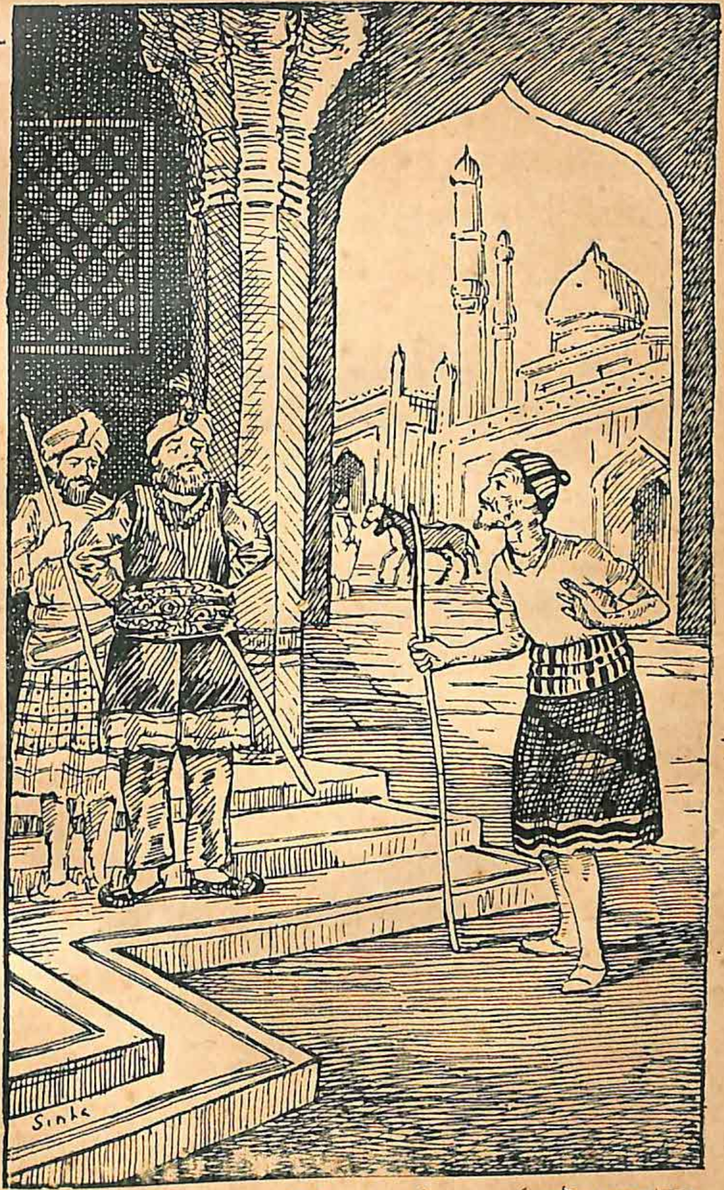
সুল্‌তান হাসিয়া কহিলেন, "মন্ত্রি! সুল্‌তান মহম্মদ বৃথা কথা কহে না। আমি কি জানিনা যে বিজয়নগর স্বাধীন! কিন্তু স্বাধীন দেশও ত পরাধীন হয়।"

সুলতানের পরওয়ানা বিজয়নগরে পৌঁছিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজার আদেশে সুলতানের দূতকে অশ্বের পৃষ্ঠে তুলিয়া পথে পথে ভ্রমণ করানো হইল। তাহার পর রাজা ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক লইয়া সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। গ্রামের পর গ্রাম সেনা-পদভরে ধ্বংশ হইয়া গেল—কত সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল। লুণ্ঠন-লোলুপ হিন্দুসেনা অবাধে গ্রাম ও নগর লুঠিতে লাগিল।

সুলতান সেনা সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই বিজয়নগরপতি সুলতানের মুদকল দুর্গ জয় করিয়া লইলেন। দুর্গরক্ষী ছয়শত সেনার একজন ভিন্ন কেহই জীবিত রহিল না! এই পরাজিত ও লাঞ্ছিত সৈনিক বহু কষ্টে গুলবর্গে যাইয়া সুলতানের নিকট পরাজয় বার্ত্তা জানাইল। ক্রুদ্ধ সুলতান বহু সেনা লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং দীর্ঘ কালের যুদ্ধের পর সুলতানের জয় হইল। বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত রক্ত-পিপাসু সৈনিকগণ চারিদিকে এমন ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল যে তাহার বর্ণনা করা যায় না। পুরুষ, স্ত্রীলোক শিশু কেহই সেবার নিষ্কৃতি পাইল না!

বাহ্‌মনী সুলতানদিগের সহিত নিরন্তরই বিজয়-নগরপতির যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ রাইচূড় দোয়াব এবং কৃষ্ণা নদীর শাখা মাল-প্রভা এবং তুঙ্গভদ্রার মধ্যে অবস্থিত মুদকল ও রায়চূড় দুর্গ। বিজয়নগরপতির ইচ্ছা ছিল যে উহা তাঁহার অধিকারে থাকিবে, কিন্তু বাহ্‌মনী সুলতানগণ প্রানপণে চেষ্টা করিয়া তাহা হইতে দেন নাই। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর যুদ্ধাদি তাই এই প্রদেশেই অধিক ঘটিয়াছিল এবং শত শত হিন্দু ও মুসলমানের শোণিতে প্রস্তর কঙ্করময় কর্কশ যুদ্ধক্ষেত্র

মুদকল ও রায়চূড়



এই পরাজিত ও লাঞ্ছিত সৈনিক বহুকষ্টে গুলবর্গে যাইয়া সুলতানের নিকট পরাজয় বার্ত্তা জানাইল।

সিক্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীই বাহ্‌মনী রাজ্যের ও বিজয়নগরের প্রধান কাহিনী। উহা কখনো বা জয়ে কখনো বা পরাজয়ে যেমন মুসলমানদিগের শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে, তেমনি হিন্দুদিগেরও বীরপণার পরিচয় দেয়।

বাহ্‌মনী রাজ্যের সুলতানগণ যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই লিপ্ত ছিলেন তাহা নহে। কোন কোন সুলতান স্বয়ং কবি ছিলেন এবং সাহিত্যের সমাদর করিতেন। কেহ বা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত মসজেদ ও অন্যান্য অট্টালিকা এক সময়ে শোভার ভাণ্ডার ছিল। সে সকল রাজউদ্যান ও স্নানাগার দেখিলে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিত। ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান যে মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বিদরের অন্যতম গৌরবরূপে বিরাজিত ছিল। সম্রাট আওরংজেব যখন বিদর অধিকার করিলেন তখন এই মাদ্রাসার একাংশে গুলি বারুদ এবং অপরাংশে অশ্বারোহী সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ একদিন বারুদে আগুণ লাগিয়া সেই মনোহর মাদ্রাসাটীর প্রায় সকল অংশই চুর্ণ বিচুর্ণ

বাণিজ্য শিল্প ও শিক্ষা

হইয়া গেল। সেই ভগ্ন প্রাসাদের যে জীর্ণ অংশ এখনো দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেই সেকালের কারু কার্য্যের পরিচয় লাভ ঘটে। এখনো যে মিনারটী বর্ত্তমান আছে তাহা প্রায় ৭০ হস্ত উচ্চ। তাহার গাত্রে নানা শিলাফলকে ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের বাক্যাবলী উদ্ধৃত রহিয়াছে। সে লেখাগুলি শ্বেতবর্ণের। সবুজ এবং সোণালা বর্ণের মিনারের গায়ে শ্বেত বর্ণের অক্ষরগুলি এখনো হীরক খণ্ডের ন্যায় দীপ্তি দেয়। সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে বাহ্মান রাজ্যে বাণিজ্য এতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে সুলতান প্রতি বৎসর গোয়া এবং চাউল বন্দর হইতে চতুর্দ্দিকে বহু অর্ণব পোত প্রেরণ করিতেন। এই সকল পোত দূর দূরান্তর হইতে যে শুধু পণ্যই বহিয়া আনিত তাহা নহে—দেশ দেশান্তরের পণ্ডিতমণ্ডলীকেও আমন্ত্রণ করিয়া রাজসভায় আনিত।

বাহ্মনী সাম্রাজ্যের পতন

নিরন্তর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার মধ্যে যে সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল তাহার পতনের পূর্ব্বে রাজমহান্দ্রি, কন্দা-পল্লী, মছলীপত্তন, বেলগাম প্রভৃতি জনপদ সমূহ তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহ বিবাদ, নিষ্ঠুরতা, সুলতানদিগের

ব্যসন ও হঠকারিতা শোষ এই সুবিস্তৃত মুসলমান-রাজ্যের ধ্বংশের কারণ হইয়াছিল। সাধারণতঃ বাহিরের শত্রু আসিয়াই দেশ জয় করে—সেই আক্রমণবেগ প্রতিহত করিতে না পারিলেই সুগঠিত রাজ্যও ধ্বংশ পায়। কিন্তু বাহ্‌মনী রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল গৃহশত্রুর আক্রমণে। সুল্‌তান হুমায়ু ভারতের নিরো। ঠিক তেমনি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুইটী বালক পুত্র সুদক্ষ মন্ত্রী গাওয়ানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই সময়েই রাজশক্তি হীনবল হইয়াছিল। সে শক্তিহীনতা তখনো বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, কারণ তখনো যুদ্ধে জয় ঘটিত, নব রাজ্য বিজিত হইত। কিন্তু শক্তিহীনতা দেখা দিয়াছিল সাম্রাজ্যের অন্তরে। তাহার পর যখন সেই মহাপ্রাণ বিচক্ষণ মন্ত্রীর ছিন্ন শির ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, কুচক্রীর পরামর্শে ও স্বার্থপরদিগের উৎসাহে এমন একটা মহাপাপ অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল যে তখন হইতেই রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পরবর্ত্তী সুল্‌তানগণ ব্যসনকেই সার করিলেন—কেহ কেহ বা এমন ছিলেন যে ৪।৫ মাস পর এক দিনের জন্য একটীবার মাত্র অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতেন! তখন নানা স্থানে বিদ্রোহ সজীব হইয়া

উঠিল—ষড়যন্ত্র শতশির তুলিল—শোণিতপাতে রাজপুরী কলঙ্কিত হইতে লাগিল। রাজমুকুট তখন বাজির খেলা হইয়া দাঁড়াইল! যে রাজ্যের অবস্থা এরূপ হয় সে রাজ্য আর টিকিয়া থাকিতে পারে না। মন্দিরের তলদেশ খনন করিয়া ফেলিলে যেমন অচিরে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, সে রাজ্যও তেমনি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। পরাক্রান্ত বাহ্‌মনী রাজ্যও তাই ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাহমনী রাজ্যের সমাধিস্থানের উপর তখন পাঁচদিকে পাঁচটী নবীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল।

দক্ষিণাপথে পঞ্চ মুসলমান রাজ্য

বিজাপুরে আদিলশাহী, গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী, বিদরে বারিদ শাহী, আহম্মদনগরে নিজাম শাহী এবং বেরারে ইমাদ শাহী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শক্তির শেষ অবস্থার পরিচয় দিতে লাগিল। উত্তর-ভারতে তখন মোগল-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। মোগলের ভারতজয় আকাঙ্খার অনলে কিরূপে এই সকল খণ্ড রাজ্য আপনাকে আহুতি দিয়াছিল তাহা সম্রাট আকবর হইতে আরংজেবের জীবন কাহিনীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

পঞ্চ মুসলমান রাজ্যের পরিচয়

বিজাপুরে আদিল শাহী রাজ্য

বাহ্‌মনী সুলতানদিগের দুর্ব্বলতা ও অত্যাচারে ফলে দাক্ষিণাত্যে যে পাঁচটী মুসলমান রাজ্য গঠিত হইয়াছিল, আদিলশাহী রাজ্য ইহাদের মধ্যে প্রধান। বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা ইস্নুফ আদিল খাঁ এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম আদিল শাহী। ইস্নুফ আদিলের জীবন-কাহিনী বিস্ময়জনক। তিনি তুর্কির সুলতান মুরাদের পুত্র। মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান হইয়া কনিষ্ঠের প্রাণবধ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। আদিলের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র। সুলতানা এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং দাস ব্যবসায়ীর নিকট হইতে আদিলের অনুরূপ মূর্ত্তির একটী বালককে ক্রয় করিয়া ঘাতকদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঘাতকগণ যখন

তাহাকেই ইসুফ আদিল মনে করিয়া হত্যা করিল, বালক ইসুফ আদিল তখন দাসব্যবসায়ীর আশ্রয়ে বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছে। এই দাসব্যবসায়ীর নাম ছিল খ্বাজা ইমাদ উদ্দীন। ইমাদউদ্দীন রাজপুত্রকে লইয়া গিয়া ইতিহাস-বিখ্যাত শেখ সুফীর হস্তে অর্পণ করিল। ইসুফ আদিল তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় যৌবনের প্রারম্ভে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং বাহ্‌মনী সুলতানের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নিজের বুদ্ধিবলে সুলতান ও প্রধান কর্ম্মচারিদিগের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইসুফ আদিল শেষে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাহ্‌মনী সুলতান সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিল। তাহারই সুযোগে ক্ষমতাশালী আমির ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ইসুফ আদিল তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজনামে খুৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। আদিল শাহী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই সময়ে দৌলতাবাদে মালিক মহম্মদ নামে একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইসুফ আদিলের পথ

আহম্মদ নগরে নিজাম শাহী রাজ্য, বেরারে ইমাদশাহী রাজ্য, গোলকুণ্ডায় কুতব শাহী রাজ্য

অনুসরণ করিয়া তিনি যে রাজ্য স্থাপন করিলেন তাহার নাম নিজাম শাহী। আহম্মদনগর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। বেরারে তখন ইমাদ উল্‌মুলক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহার ইমাদ শাহী রাজ্যের রাজধানীতে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হইতে লাগিল। গোলকুণ্ডার শাসনকর্ত্তা এতদিন একরূপ স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু সকলেই যখন এক একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন তিনিই বা কেন নীরবে বসিয়া থাকিবেন। তিনিও কুতবশাহী রাজ্য স্থাপন করিলেন।

বিদর

বিদরের নাম-সর্ব্বস্ব সুলতান তাঁহার মন্ত্রী কাশিম বারিদের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তল মাত্র ছিলেন। সুলতানের যখন চক্ষু ফুটিল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি রাজ্যের কেহ নহেন, তাঁহার মন্ত্রী কাশিম বরিদই প্রকৃত সুলতান। তখন তিনি নিজের শক্তি ও স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর সহিত সুলতানের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাশিম বারিদ প্রথমে পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু অনতি বিলম্বে আবার যে যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে

মন্ত্রীরই জয় হইল। সুলতানের বিজিত সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। কাশিম বারিদ মহা উল্লাসে বিজয় নগরে প্রবেশ করিলেন। বিদরকে কেন্দ্র করিয়া অনতিকাল পরেই বারিদ সাহী রাজ্য স্থাপিত হইয়া গেল।

বিজাপুর

এই পঞ্চ মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিজাপুর রাজ্যই ছিল সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত, শক্তি সমন্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুলতান ইসুফ আদিল যে শুধু একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন তাহা নহে—রাজবংশে জন্মলাভ করায় তাঁহার অনেক রাজোচিত গুণ ছিল। তিনি বিচারে ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মমতে উদার, পরদুঃখে কাতর, ও ললিত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে কাব্য ও কবি বিজাপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থে বিজাপুর নানা সৌধমালায় ভূষিত হইয়াছিল, তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে তাঁহার সেনাবৃন্দ সকলেই বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিল।

বিজাপুর রাজ্য যখন সংস্থাপিত হইল তখন দক্ষিণে সুপ্রতিষ্ঠিত বিজয় নগর রাজ্যের মহা গৌরবের দিন।

দক্ষিণে বিজয়নগর
পশ্চিমে মহারাষ্ট্র

বিজয় নগরের আধিপত্য তখন সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত। প্রদীপ যেমন নিবিবার পূর্ব্বে একবার তেজের সহিত জ্বলিয়া উঠে—সেইরূপ। বিজয় নগরের সেই তেজ বিজাপুরের সহ্য হইলনা। বিজাপুরে ও বিজয় নগরে কলহ চলিতে লাগিল। পশ্চিম-ভারতে তখন আর একটী বীর চতুর ও কার্য্যনিপুণ জাতি ধীরে ধীরে শির তুলিতেছিল। সে জাতি একদিন ভারতের ইতিহাসের কায়া পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিজেদের দোষে পারে নাই। এই বীর জাতি ইতিহাসে মহারাষ্ট্র জাতি নামে পরিচিত।

অন্তর্বিপ্লব

হিন্দুর শক্তি যখন দক্ষিণে ও পশ্চিমে এত প্রবল ছিল তখন দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজশক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য সারা মুসলমান রাজ্যের সহিত মিলনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে মিলন ঘটিল না। ঈর্ষ্যা ও দূরদর্শীতার অভাব পাঁচটী মুসলমান রাজ্যকে মিলনের বন্ধনে বাঁধিতে পারিল না। দিবা নিশি রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে লাগিল। আজ আহম্মদনগর বিজয় নগরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া বিজাপুরের উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্নবান হইল—

আবার পরদিনই বিজাপুর বিজয় নগরের বন্ধু হইয়া আহম্মদনগরকে ধ্বংশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পাঁচটী মুসলমান রাজ্যের পতনের ইহাই অন্যতম প্রধান কারন। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে বিজারপুরপতি আদিল শাহ মনে করিলেন যে তাঁহার রাজ্য মধ্যে সিয়া ধর্ম্মমত প্রচলিত করিবেন।—তাঁহার রাজ্যের অনেকেই সুন্নী মতাবলম্বী ছিল। তাহারা সুলতানের এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সিয়া মত প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সুলতান কাহারও উপর কোন অত্যাচার করিলেন না বটে, কিন্তু প্রজাগণ তাঁহাকে অবিশ্বাস ও বিরাগের চক্ষে দেখিতে লাগিল। শক্তিশালী মুসলমান রাজ্যগুলি দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার উচ্ছেদ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। আদিল শাহের জীবনের বহু বর্ষ এই ধর্ম্মযুদ্ধে অতিবাহিত হইয়া গেল।

বিজাপুর সুলতান ও পর্ত্তুগীজ অতিথি

বিজাপুরের সুলতানের অদৃষ্টে শান্তি সুখ ও বিশ্রাম ছিলনা। তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়া শক্তি-বৃদ্ধি করিতে না করিতেই তাঁহার সহিত ভারতের নবীন অতিথি পর্ত্তুগীজ দিগের কলহ আরম্ভ হইল—কলহ স্থানে স্থানে যুদ্ধে

পরিণত হইল। সুলতানের ইচ্ছা ছিল যে কিছুতেই পর্ত্তুগীজদিগকে ভারতে স্থায়ী আবাস স্থান দিবেন না। কিন্তু পর্ত্তুগীজগণও জানিত যে ভারতের পশ্চিম তীরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসিতে না পারিলে ভারতের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া হইবে না! সুতরাং কলহের কোন অবধি রহিল না। এই কলহে লিপ্ত থাকিতে থাকিতেই ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে আদিল শাহ মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন।

মালিক হুসেন নিজাম উলমুলক

নিজামশাহী রাজ্যের প্রতিষ্টাতা মালিক আহম্মদের পিতা একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকালে যুদ্ধে বন্দীকৃত হইয়া তিনি বাহমনী সুলতান আহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইয়া ছিলেন। জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণের তখন নাম হইয়াছিল মালিক হুসেন। সুলতান আহম্মদ শাহ, মালিক হুসেনকে বিশেষ যত্ন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। হুসেনের বুদ্ধি ও শক্তি অল্পকাল মধ্যেই সুলতানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আহাম্মদ শাহের পুত্র মামুদের রাজত্বকালে মালিক হুসেন এক হাজারি সেনা নায়ক হইয়া নানা স্থানে নিজের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে তেলিঙ্গনা

রাজ্যের শাসন ভার তাঁহার উপরই অর্পিত হইয়াছিল। জীর্ণ বাহমনী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়া তিনিই পরে নিজাম উল্‌মুলক আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন।

মালিক হুসেন যখন নিজে এইরূপে যশ মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহার পুত্র মালিক আহম্মদও কঙ্কন প্রদেশে যাইয়া পার্ব্বত্য সামন্তদিগের সহিত যুদ্ধে কৃতীত্ব লাভ করিতেছিলেন। তাঁহারই শৌর্য্যবলে শেষে কঙ্কন প্রদেশ মুসলমানের করায়ত্ব হইয়াছিল। নিজাম উল্‌-মুলক বিদ্রোহী হইয়া বিজয় নগর অধিকার করিলেন বটে কিন্তু কোন গুপ্ত ঘাতক তাঁহাকে হত্যা করিল। তখন মালিক আহম্মদ পিতার উপাধী গ্রহণ করিয়া অসির বলে নিজের পথ মুক্ত করিতে লাগিলেন। বিদরের সহিত তখন মালিক আহম্মদের যুদ্ধ চলিতেছিল—যুদ্ধে তাঁহার জয়ও হইয়াছিল। বিজাপুরের ইস্থফ আদিল বিদরের শক্তি ও প্রাধান্য দেখিতে পারিতেন না। তিনি মালিক আহম্মদকে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করাইলেন! তাহারই ফলে আহম্মদ-নগরকে কেন্দ্র করিয়া নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত

আহম্মদ নগর

হইয়াছিল। আহম্মদ শাহ পবিত্রচেতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি যখন অশ্বারোহণে রাজপথে বাহির হইতেন তখন পাছে পর-রমণীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, এই ভয়ে দক্ষিণে কি বামে চাহিতেন না। সুল্‌তান মালিক আহম্মদ দ্বৈরথ যুদ্ধ ভাল বাসিতেন এবং কখনো কোন যুবক আর একজন যুবকের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেই সুলতান তাহা-দিগকে দ্বৈরথ সমরে নিযুক্ত করিতেন! সেই সমরে যে প্রথমে আহত হইত সুল্‌তান তাহাকেই মোকদ্দমায় পরাজিত বলিয়া মনে করিতেন! ক্রমে দ্বৈরথ সমর করিবার উত্তেজনা দাক্ষিণাত্যের অনেক সমৃদ্ধ বংশে প্রবেশ করিয়া মুসলমান যুবকদিগকে অসিচালন কৌশলে পটু করিয়া তুলিয়াছিল।

নিজামশাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক আহম্মদের পিতা যেমন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইমাদশাহী রাজ্যের

বেরার

প্রতিষ্ঠাতার পিতাও তেমান কেনারী দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনিও যুদ্ধে বন্দী হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং ক্রমে যশোলাভ করিয়া বেরারের বাহ্‌মনী শাসনকর্ত্তার অধীনে ইমাদ্‌-উল্‌ মুলক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। তিনি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুল্‌তানগণ মিলিত হইয়া সেকালের মুসলমান-অধিকৃত দক্ষিণাপথের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই রাজ্য বিভাগের সময় গোদাবরী এবং পাইন-গঙ্গা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদ তাঁহার অংশে পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ইমাদশাহী রাজ্যের প্রথম সুলতান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি আহম্মদ নগরের শত্রু হইয়াছিলেন। এই শত্রুতাই কালে (১৫৭২ খ্রীঃ অঃ) ইমাদশাহী রাজ্যকে আহম্মদ নগরের অধীন করিয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিল।

বাহ্‌মনী সুল্‌তানদিগের সময়ে গোলকুণ্ডা তেলিঙ্গনা প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে ছিল।

গোলকুণ্ডা

বাহ্‌মনী রাজ্য তখন ভারতের পূর্ব্বতীরে মছলিপত্তন্ ও কোকনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওরঙ্গলের হিন্দু নৃপতি তখন মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ওরঙ্গল রাজ্যের কতকগুলি হিন্দু সামন্ত তখন সর্ব্বদা বিদ্রোহ করিতেন। তেলিঙ্গনার মুসলমান শাসনকর্ত্তা কিছুতেই তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। পঞ্চদশ

শতাব্দীর শেষ ভাগে পারস্য দেশীয় বড় মালিক কুতুব-উল্-মুলক বাহ্মনী সুল্তান মহম্মদের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি একবার সুল্তানের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন দক্ষিণাপথের সুল্তানগণ একে একে বাহ্মনী রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করিতেছিলেন, তখনো কুতব-উল্-মুলক বিদ্রোহী হন নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনিও স্বাধীন হইয়া কুতবশাহী রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন।

নব রাজ্য স্থাপিত করিয়াই সুলতান সর্ব্বপ্রথমে গোলকুণ্ডার দুর্গটী সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। সে দুর্গ এতই সুদৃঢ় হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী কালে সম্রাট আরাংজেব পর্য্যন্ত ছলনার আশ্রয় না লইয়া উহা জয় করিতে পারেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

বিজয়নগরের পতন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মালপ্রভা ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত রায়চূড় ও মুদকল দুর্গ লইয়া বিজয় নগর ও বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। বিজয় নগরের রাজা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাহমনী সুল্তানকে জানাইয়াছিলেন যে, রায়চূড় এবং মুদকল দুর্গে মুসলমানের অধিকার নাই—উহা আনগুন্দি রাজার রাজ্যের অন্তর্গত। এই আনগুন্দি রাজ্যই পরবর্ত্তী কালে বিজয় নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। মুসলমান সুল্তান কোন দিনই হিন্দু রাজার এই দাবী গ্রাহ্য করেন নাই। দাবীর কথা শুনিলেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন! যুদ্ধে কখনো বা হিন্দুর জয় হইত—কখনো বা মুসলমানের জয় ঘটিত। শেষে বাহ্মনী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুর্ণ হইয়া গেল—হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয় নগর দেড়শত বৎসর তাহার প্রথম রাজবংশের অধীনে থাকিয়া শলুভ রাজবংশের চরণলগ্ন

প্রাচীন কলহ

হইল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দক্ষিণাপথের নানা স্থানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, কিন্তু এই প্রাচীন কলহের নিবৃত্তি হইল না!

হিন্দু ও মুসলমানের রণযাত্রা।

বিজাপুরে নব গঠিত রাজ্যের সুল্‌তান ইসমাইল আদিল শাহ বহুদিন হইতেই শ্যেন দৃষ্টিতে রায়চূড়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। সুযোগের অভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং রায়চূড় অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার একলক্ষ চল্লিশ সহস্র সেনা—অশ্বারোহী ও পদাতিক—দিন্ দিন্ রবে সুল্‌তানের অনুগমন করিয়া কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে পটাবাস স্থাপন করিল। বিজয়গনর পতি কৃষ্ণদেব রায় যখন শুনিলেন যে আদিল শাহ বহু সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন তখন তিনিও সাত-লক্ষ ছত্রিশ সহস্র সেনা ও ৫৫০টী হস্তী লইয়া বিজয়নগর হইতে যাত্রা করিলেন। একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া এই বিরাট বাহিনী কৃষ্ণানদীর দিকে ধাইয়া চলিল। শত শত ঢাক ঢোল ও শিঙ্গা ঘোররবে বাজিয়া বাজিয়া প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়নগরপতির যাত্রাপথকে মুখরিত করিয়া তুলিল।

কৃষ্ণা তীরে যেখানে কৃষ্ণদেব রায়ের পটাবাস স্থাপিত হইল, সহসা যেন তথায় একটী বিশাল নগরী শির তুলিল। ছাউনীর চতুর্দ্দিক কণ্টকে পূর্ণ বৃক্ষের বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া প্রবেশ পথে বীর সেনাগণ প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

কৃষ্ণদেব রায়ের ছাউনী

এই কণ্টক বেষ্টনীর অভ্যন্তরে বিজয়নগর পতির গৃহ দেবতা স্থাপিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে দেবতার অর্চ্চণা করিতে লাগিলেন। রাজার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ ও খোজা প্রহরীদের থাকিবার জন্য এই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে সতর্ক প্রহরিগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিন রাত্রি পাহারায় নিযুক্ত হইল। যে সকল ভৃত্যবর্গ রাজার গৃহকর্ম্মের জন্য নিযুক্ত ছিল তাহারা এই সকল প্রহরিদিগের নিকট স্থান পাইল। তাহাদের পুরোভাগে রহিলেন সেনানায়কগণ। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। ইঁহাদেরও অগ্রে গুপ্তচরদিগের স্থান ছিল। তাহারা সর্ব্বদা ছাউনীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপক্ষের গুপ্তচরের সন্ধান করিত। বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য রজকগণ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাদের বাসস্থান অন্যদিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

প্রত্যেক সেনানায়কের অধীনে যে সকল সেনা ছিল তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বাজার বসিত। সে সকল বাজারে প্রচুর পরিমাণে মাংস বিক্রীত হইত। চাউল, গম, কলাই প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীরত অভাবই ছিল না। প্রতিদিনের আবশ্যকের জন্য যে সকল জিনিষ চাই সে সমুদয় এই বাজারে অপর্য্যাপ্ত রূপে পাওয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ছাউনীর মধ্যে স্বতন্ত্র বাজার বসিবার ব্যবস্থা ছিল।

ছাউনীর মধ্যে বহু পথ ছিল। সেই সকল পথের ধারে মণি মাণিক্য বিক্রীত হইত। বহু বস্ত্র বিক্রেতা পথের পার্শ্বে বসিয়া রাশি রাশি বস্ত্র বিক্রয় করিত। তেত্রিশ সহস্র চারি শত অশ্ব এবং পাঁচ শত পঞ্চাশটী হস্তীর জন্য প্রতিদিন যে কত খড় ও ঘাস প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। রায়চুড়ের ন্যায় কঙ্কর প্রস্তরময় স্থানে স্থানে বালুকাপূর্ণ দেশে তাহা আদৌ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া রাজাদেশে উহাও সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছিল। শুধু অশ্ব ও হস্তী নহে—পটাবাস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য অগণিত গর্দ্দভ ও খচ্চর সঙ্গে ছিল। সুতরাং তাহাদেরও আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল।

বিজয়নগরপতি যখন শুনিলেন যে সুল্‌তান আদিল-

শাহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি তাঁহার আদেশে দলে দলে গুপ্তচর সকল ধাবিত হইল এবং সর্ব্বদা তাঁহার গতিবিধির সন্ধান লইতে লাগিল। শেষে একদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের কামানের গর্জ্জণে গগন পবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

রায়চূড়ের যুদ্ধ

রাজাকৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং সেনা চালনা করিতেছিলেন। প্রথমে মনে হইল যেন হিন্দু সৈন্য আর টিকিতে পারে না। তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল। রাজা প্রমাদ গণিলেন এবং বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুসংহার করিবার জন্য সম্মুখে ধাইয়া চলিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার বারিপ্রবাহের ন্যায় হিন্দু সেনা ছুটিল। মুসলমান সেনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারাও সেদিন মরণ পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে আর থাকিতে পারিল না—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে পলায়ন করিল। সন্মুখেই নদী। তাহার স্রোত তীব্র—তাহা অতিক্রম করা দুরূহ। মুসলমান সেনা যখন নদী পার হইতে চেষ্টা করিল তখন শতে সহস্রে ডুবিয়া মরিল —হিন্দুসেনার তরবারির আঘাতে শতে সহস্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সুল্‌তান আদিলশাহ তাঁহার সেনাকটক হারাইয়া শুধু সাতটী মাত্র অনুচর সহ কোন

প্রকারে পলায়ন করিলেন। রায়চুড় দুর্গে বিজয়নগরের জয়পতাকা উড্ডীন হইল। শিঙ্গা ভেরী ঢাক প্রভৃতি ঘোর রোলে বাজিয়া হিন্দু নরপতির জয় ঘোষণা করিল। রায়-চুড়ের যুদ্ধ দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রনীতিকে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল যে মুসলমান সুলতানগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত হিন্দুর রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। জয়লাভে উন্মত্ত হিন্দুদিগের চিত্তে তখন যে অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা আসিয়াছিল তাহা বিজয়নগরের পতনকালকে নিকট করিতে লাগিল।

যুদ্ধের পরিণাম

যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া কৃষ্ণদেব রায় মহোল্লাসে রায়চুড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গ রক্ষকগণ ভাবিয়াছিল বুঝি তাহাদের শোণিতে দুর্গতল রঞ্জিত হইবে। কিন্তু তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণদেব তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিলেন। যে সকল মুসলমান সুলতানদিগের দূত রাজার অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে সম্মানিত করিলেন না। সুলতানগণ এই সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়াছিলেন। বিজয়ী

জয়দৃপ্ত কৃষ্ণদেব রায়ের দাম্ভিকতা

কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরে ফিরিয়া আসিয়া মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। তাঁহারই বীরপণায়—তাঁহারই সেনার সাহায্যে যুদ্ধে জয় হইয়াছিল বলিয়া রায়রাজা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে সকল সুলতান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে বসিতে পর্য্যন্ত বলিলেন না। স্থানান্তর গমনকালে যতক্ষণ তিনি তাঁহাদিগকে আপন আপন অশ্ব আরোহণ করিতে অনুমতি না দিলেন ততক্ষণ তাঁহাদিগকে অশ্বারূঢ় রায়রাজ্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজেই চলিতে হইল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে আত্মবিবাদ না মিটাইলে এ লাঞ্ছনার শেষ হইবে না। যাহাতে দক্ষিণাপথের মুসলমান সুলতানগণ অবিলম্বে গৃহ বিবাদ মিটাইয়া মিলনের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয় আলি আদিল প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিলেন যে এই মিলন সংঘটিত না হইলে বর্ত্তমান শক্তি বিজয়নগরের

মহামিলন

নিকট দক্ষিণাপথের সুলতানাদিগের মান মর্য্যাদা আর থাকিবেনা! আলি আদিল এই মিলনের প্রস্তাব লইয়া গোলকুণ্ডার সুলতান ইব্রাহিম মুতব শাহের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিলেন। ইহার চেষ্টায় বিজাপুর ও আহম্মদনগরের চির বিরোধ মিটিয়া গেল। আহম্মদনগরের সুলতান হুসেন নিজামশাহ সেই মিলনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যা চাঁদবিবির সহিত আলি আদিলের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় করিয়া লইলেন। আদিল শাহের কন্যার সহিত নিজাম শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহও সেই সঙ্গে সম্পন্ন হইয়া গেল। সেই আনন্দোৎসাহের মধ্যে বিজাপুর গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহম্মদনগর আপন আপন গৃহ বিবাদ ভুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, দাম্ভিক বিজয়-নগরপতিকে উৎখাত করিতেই হইবে। কৃষ্ণদেব রায় যে বিষতরুর বীজ পান করিয়াছিলেন, রামরাজা বারি সিঞ্চনে তাহাকে মহামহীরূহে পরিণত করিলেন।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের এক মুক্ত প্রান্তরে গোলকুণ্ডা, বিদর, আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সেনা সম্মিলিত হইল। সকলের মুখেই দৃঢ় পণ সূচিত হইতে

লাগিল। এই মিলিত বাহিনী শৈল শিখরচ্যুত তুষার স্তূপের ন্যায় ভীম বেগে বিজয়নগর অভিমুখে ধাইয়া চলিল। কে তখন উহার গতিরোধ করিতে পারে? রামরাজার দূত যখন এই সংবাদ রাজসভায় নিবেদন করিল, তখন গর্ব্বিত রামরাজা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। পরে যখন তিনি বুঝিলেন যে দাক্ষিণাত্যের মিলিত মুসলমান শক্তি তাঁহাকে ধ্বংশ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতা তিম্ম রাজের নেতৃত্বে এক লক্ষ পদাতিক, বিংশ সহস্র অশ্বারোহী এবং পাঁচশত হস্তী প্রেরণ করিলেন। এই বৃহৎ বাহিনী লইয়া তিম্ম রাজা কৃষ্ণা নদী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভাবিলেন যেমন করিয়াই হউক, সুল্‌তানদিগকে নদী অতিক্রম করিতে দিবেন না। তিম্ম রাজার পশ্চাতে সৈন্য সামন্ত লইয়া ভেন্‌কাতাদ্রি চলিলেন। রাজ্যের অবশিষ্ট সেনা লইয়া সর্ব্ব পশ্চাতে চলিলেন—রামরাজা। তিনি তখন অশীতি-পর বৃদ্ধ হইলেও যুবকের ন্যায় কর্ম্মক্ষম ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান তখন মরণ-যজ্ঞে ব্রতী হইল।

মরণ যজ্ঞ

নানা কৌশলে মুসলমান সেনা কৃষ্ণা নদী পার হইল—নানা কৌশলে অগ্রসর হইয়া তালিকোটার বিশাল

হিন্দুর শ্মশান তালিকোটা

ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তালিকোটাই দক্ষিণ ভারতের পানিপথ। উত্তর ভারতের পানিপথে যেমন একদিন মহারাষ্ট্র বাহিনী পরাজিত হইয়া হিন্দু প্রতিষ্ঠার শেষ মন্দির বিচূর্ণীত করিয়াছিল, তেমনি এই তালিকোটার ক্ষেত্রেও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু প্রতিষ্ঠার উচ্চ মন্দির ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু হইয়াছিল!

হুসেন নিজাম শাহ মুসলমান বাহিনীর মধ্যভাগের কর্ত্তৃত্ব লইলেন। তাঁহার দক্ষিণে রহিলেন বিজাপুরের আলি আদিল ও বামে সজ্জিত হইলেন বারিদ শাহ ও কুতুব শাহ। লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ অনলবর্ষী কামান শ্রেণী সম্মুখে স্থাপিত হইল। হিন্দু পক্ষে মধ্য ভাগে রহিলেন রামরাজা, দক্ষিণে ভ্রাতা ভেন্‌কাতাদ্রি ও বামে অপর ভ্রাতা তিম্ম রাজা। দুই সহস্র রণহস্তী এবং এক সহস্র কামান স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইল! তখনো রামরাজা মনে করিতেছিলেন, এ যেন খেলার যুদ্ধে বালকের উল্লাস—মুহূর্ত্তেই মুসলমান সেনা—রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

হিন্দুর কামান তালিকোটার ক্ষেত্রে প্রথম গর্জ্জিয়া উঠিল। মধ্যাহ্ন তপন তখন মাথার উপর প্রখর

কর বর্ষণ করিতেছিল। সে কামান রাশির ধূমে গগন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল—সে বিরাট গর্জ্জন কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে শৈল শিখর হইতে শৈল শিখরান্তরে মিলাইয়া গেল। মুসলমানের কামান সেদিন মূহুর্মূহু অনল বর্ষণ করিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান সেদিন মরণ পণ করিল। হিন্দু ভাবিল তাহার দুই শতাধিক বর্ষের স্বাধীনতা, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা সবই যে যায়! মুসলমান ভাবিল, যদি বাঁচিতে হয়—যদি মান রাখিতে হয় তবে আগে প্রাণ দান করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান তাই মরণ আলিঙ্গনে পরস্পরকে বাঁধিল!

রামরাজা এতক্ষণ শিবিকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলিতেছে, তখন তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া রক্তবর্ণ মখমলের কারুকার্য্যময় সুন্দর চন্দ্রাতপ নিম্নে মণিমুক্তা খচিত রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রাতপের চারিপার্শ্বে মুক্তার মালা দুলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশে রাশি রাশি মুদ্রা, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত বহু বলয় কঙ্কন হার প্রভৃতি ভূষণ তাঁহার সম্মুখে সজ্জিত হইল। তিনি কহিলেন,—'আজ আমি বীরের পূজা করিব—এ সকল তাহারই অর্ঘ্য! অগ্রসর হও অগ্রসর

হও—বীর বিক্রমে শত্রুর উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত কর।'

হিন্দুর বাম ও দক্ষিণ ভাগ একবার চঞ্চল হইল—পরক্ষণেই তাহারা উল্কার ন্যায় মুসলমান সেনাব্যূহ আক্রমণ করিল। আলি আদিল এবং কুতব শাহ দেখিলেন সে দুর্ব্বার বৈরীকে পরাভূত করা অসম্ভব! হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে সেনাগণ মরিতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান—পদাতিক অশ্বারোহীর মৃত দেহে সমর ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল! রুধিরের স্রোত বহিল। তখন হুসেন নিজাম তাঁহার সেনা লইয়া ভীম বেগে হিন্দু-ব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। হিন্দু সেনা স্তম্ভিত হইল—সে আক্রমণ রোধ করিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিল—কিন্তু স্থির থাকিতে পারিল না। রামরাজা সিংহাসন ছাড়িয়া আবার শিবিকায় উঠিলেন। বিপক্ষের একটী মত্ত হস্তী সেই শিবিকাকে আক্রমণ করা মাত্র বাহকগণ শিবিকা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পরমুহূর্ত্তেই বন্দীকৃত বৃদ্ধ রামরাজা নিজাম শাহের নিকট আনীত হইলেন। নিজাম শাহের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছিন্ন: শির ভূতলে লুটাইল। সেই রুধিরাক্ত শির তুলিয়া লইয়া উন্মত্ত মুসলমান সেনা

শূলাগ্রে প্রোথিত করিল এবং উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেকালে যুদ্ধে রাজা বা সেনাপতির মৃত্যু হইলেই তাঁহার সেনাদল মেষের ন্যায় পলায়ন করিত। রাম-রাজার ছিন্ন শির দেখিবামাত্র হিন্দু সেনা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। বিজয়ী মুসলমান সেনা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। এইবার এত সেনা মরিল যে তাহাদের রুধির স্রোতে নিকটবর্ত্তী নদীর জল পর্য্যন্ত লোহিত হইয়া উঠিল!

বিজয়ী মুসলমান সেনা নিঃশঙ্কে লুণ্ঠন করিতে করিতে অগ্রসর হইল এবং দুই শতাধিক বর্ষের চেষ্টায় সুসজ্জিত অতি সমৃদ্ধ বিজয় নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার দেব মন্দির, প্রাসাদ, বিপনী, উদ্যান, রঙ্গভূমি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিল! বিজয় নগর শ্মশান হইল—দাক্ষিণাত্যের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য লোপ পাইল!

বিজয় নগরের পতন হইল—হিন্দুর প্রতিষ্ঠা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহাতে মুসলমান সুলতান-দিগের লাভ হইল না। যে মিলনের বন্ধন তাঁহাদিগের বাহুতে অমিত বল দিয়াছিল, সে বন্ধন অধিক দিন থাকিল

তালিকোটার পরিণাম



বিপক্ষের একটী মত্ত হস্তী সেই শিবিকাকে আক্রমণ করা মাত্র বাহকগণ শিবিকা ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। দক্ষিণাপথ পৃ—১৫১।

না। পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল হিন্দু শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে জয় লাভ করিবার আশায় মুসলমানগণ তখন সর্ব্বদাই বল বৃদ্ধি করিতেন। সে হিন্দু শক্তি অপসৃত হইবামাত্রই বহু সেনা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এদিকে পুরাতন কলহের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিয়া সুল্‌তানদিগকে এমনই হীনবীর্য্য করিয়া দিল যে তাঁহারা অচিরেই দিল্লীর মোগল বাদশাহের চরণে আপনাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণাপথের পঞ্চ মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিদরই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। প্রবল বিজাপুরের সহিত কলহের ফলে বিদর বিজাপুরের অধিকৃত জনপদ মাত্র হইয়া গেল। আহম্মদনগরের সহিত বিবাদের ফলে, তালিকোটার যুদ্ধের পর মাত্র ৮ বৎসর মধ্যে বেরারের পতন ঘটিল। উহা শেষে আহম্মদনগরের অন্তর্গত হইয়া গেল। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথের পঞ্চ মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কেবল আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা স্বাধীনতা ও পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান রহিল—কিন্তু তাহাদের গৃহবিবাদ মিটিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ সুল্‌তানা

ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথ ইতিহাসে শতমুখে কীর্ত্তিতা। কিন্তু ভারতের চাঁদ সুলতানা এখন বিস্মৃতা।

এলিজাবেথ ও চাঁদ সুল্‌তানা

দক্ষতায় রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও গুণপণায় চাঁদ সুল্‌তানা এলিজাবেথ অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি যে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে রাজ্য আয়তনে ইংলণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে—তাহার জনসংখ্যা সেকালের ইংলণ্ডের জনসংখ্যা অপেক্ষা কম ছিলনা। তাহার সমৃদ্ধি ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিরই তুল্য ছিল, তাহার নাগরিকগণ ইংলণ্ডবাসিদিগের ন্যায়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। একই সময়ে তখন পৃথিবীর দুইটী স্থানে দুই জন অশেষ গুণসম্পন্না নারী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—মানবের ইতিহাস সেই দুই জনকেই গৌরবের জয়মাল্য অর্পণ করিয়াছে। একজন ইংলণ্ডের এলিজাবেথ আর একজন বিজাপুরের সুল্‌তানা চাঁদ।

চাঁদ সুলতানার চরিত্র

বিজাপুরের সুলতান আলি আদিলের মৃত্যুর পর চাঁদ সুল্‌তানাই রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া রাজ্যের নানা শত্রু নানা উৎপাত করিতে লাগিল—তাঁহার স্বামীর রাজ্য যাহাতে ধ্বংস হয় তাহার জন্য কতই না আয়োজন করিল—কৌশলে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। কিন্তু বীররমণী চাঁদ সুল্‌তানা কোনো দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তাঁহার অসীম সাহস ও পুরুষোচিত বীর্য্য, তাঁহার উদারতা ও সরলতা, তাঁহার দানশীলতা ও দয়া, তাঁহার পবিত্রতা ও মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে সকল পাষণ্ডকেই নতশির হইতে হইয়াছিল। সিংহিনীর সন্মুখে কি শৃগাল দাঁড়াইতে পারে? স্বামী আলি আদিলের সঙ্গে তিনি কতদিন অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কতদিন বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিত হইয়া বীরজায়া বীর স্বামীর সহচরীরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শান্তির সময়ে নানা রাজকর্ত্তব্য তাঁহাকেই পালন করিতে হইত। তিনি সেজন্য প্রকাশ্য দরবারে আসিতেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। লোকে যে তাঁহার সাহসের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত তাহা নহে, তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও পক্ষপাতহীনতা

প্রজা সাধারণের ভক্তির অর্ঘ্য আনিয়া তাঁহার চরণমূলে স্থাপিত করিয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর চাঁদ সুল্‌তানা রাজ্যের ভার লইলেন কারণ নবীন সুল্‌তান তখন নয়বর্ষ বয়স্ক বালক মাত্র।

বিজাপুর দুর্গ ও রাজ্য রক্ষা

কিছুদিন নির্ব্বিবাদে কাটিল বটে, কিন্তু সহসা একদিন নানা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পাইল। রাজ্যে যখন গোলযোগ ঘটিয়াছে, রাজ্যের ভার তখন একজন নারীর হস্তে—ইহা দেখিয়াই বেরর, বিদর এবং গোলকুণ্ডার সুল্‌তানগণ মনে করিলেন পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা অমনি বহু সেনা লইয়া বিজাপুর অবরোধ করিলেন। বিজাপুর রক্ষার জন্য তখন মাত্র দুই সহস্রের অধিক সেনা ছিলনা! কিন্তু রাজ-মন্ত্রী যেমন চতুর তেমনি রণপটু ছিলেন। স্বয়ং চাঁদ সুল্‌তানা প্রতি রজনীতে দুর্গের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার কতক সৈন্য দুর্গের বাহিরে যাইয়া শত্রুর খাদ্য কাড়িয়া লইল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। একদিন দুর্গপ্রাকারের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত্রুগণ সেই মুক্তপথে দুর্গে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। চাঁদ সুলতানা নগরের

সমুদয় স্থপতিদিগকে একত্র করিয়া স্বয়ং তাহাদের সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভগ্ন প্রাকার নূতন কলেবর ধারণ করিল। তখন দারুণ বর্ষা। অবিরাম বারিপাত হইতেছিল। সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেও চাঁদ সুলতানা দুর্গপ্রাকার পরিত্যাগ করেন নাই। মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই। এইরূপে দীর্ঘ একবৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসরের চেষ্টাতেও দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া শত্রুগণ লজ্জায় ফিরিয়া গেল। চাঁদ সুল্‌তানা মনে করিলেন, এতদিনে তাঁহার বিশ্রামের অবসর আসিল।

সেই সময়ে একজন সেনাপতির সহিত প্রধান অমাত্যের বিবাদ বাধিল। সেনাপতি অমাত্যের দুইটী চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন। উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হইল, নানা অত্যাচারে বিজাপুর কলঙ্কিত হইতে লাগিল। বিদ্রোহিগণ চাঁদ সুলতানাকে পর্য্যন্ত আর মানিতে চাহিল না। এইরূপে চারি বর্ষ অতীত হইয়া গেল। ক্রমে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বালক রাজা তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। চাঁদ সুলতানা মনে করিলেন পিত্রালয় আহম্মদনগরে গিয়া শান্তিসুখ লাভ করিবেন। পিত্রালয়ে আসিয়া

আহম্মদনগরে অরাজকতা

দেখিলেন, সেখানে রাজসিংহাসন লাভের চেষ্টায় পিতা পুত্রকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, পুত্র পিতাকে হত্যা করিতেছে। রাজধানী রাজা শূন্য দেখিয়া লুণ্ঠনকারিরা অবাধে দুর্গ অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছে! শেষে যখন বিজাপুরের সঙ্গে আহম্মদনগরের সন্ধি হইল, তখন চাঁদ সুল্‌তানা পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া নিজের রাজ্য বিজাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মাতৃহারা শিশু যেমন বহুদিন পর মাকে পাইলে আনন্দে মত্ত হয়, বিজাপুরের লোকেরাও তাহাদের জননীকে পাইয়া তেমনি আনন্দে মগ্ন হইল।

মোগলের দক্ষিণাপথে প্রবেশ

সে আজ অনেক দিনের কথা—মধ্য এসিয়ায় পিতৃ-রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বীয় বাহু ও বুদ্ধিবলে মোগল বাবর কাবুলকে কেন্দ্র করিয়া একটী রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে পাঠান ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে একান্ত অপ্রিয় করিয়া তুলিল। দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিয়া কাবুল হইতে বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের ইতিহাস বিখ্যাত যুদ্ধে বাবর জয়ী হইলেন। ভারতে তখন

মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাবরের কিঞ্চিৎ অধিক ৫০ বৎসর পর আকবর যখন দিল্লীর সম্রাট হইলেন তখন ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার পদানত হইল। তিনি তখন দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ছল পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। আহম্মদ নগরের রাজমুকুট লইয়া তখন তিনটা দল হইয়াছিল। প্রত্যেক দলই এক একজনকে সুলতান বলিয়া উপস্থিত করিল। দেশে ঘোর অশান্তি আরম্ভ হইল।

সম্রাট আকবরের পুত্র মুরাদ তখন গুজরাটে থাকিয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিবার সুযোগ খুজিতেছিলেন, এমন সময় একটী দলের নেতা সম্রাট-পুত্রের নিকট গিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিল। কাল বিলম্ব না করিয়া রাজকুমার মুরাদ ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া আহম্মদনগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আহম্মদনগর রক্ষার্থ চাঁদসুলতানার আগমন

আহম্মদনগর তখন অরক্ষিত। তাহার সেনাদিগের প্রাণে নবোৎসাহ প্রদীপ্ত করিতে পারে এমন তখন সেখানে কেহ ছিলনা। অন্তর্বিরোধে সকল শক্তি তখন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। যিনি রাজকুমার মুরাদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে আহম্মদনগরকে জয় করিবার জন্যই মুরাদ

সসৈন্যে আসিতেছেন—আহম্মদনগরের অন্তর্বিরোধ দূর করিবার জন্য নহে! তিনি তখন হায় হায় করিতে লাগিলেন! রাজ্যের প্রজাগণ মিলিত হইয়া স্থির করিলেন, যদি কোনো ক্রমে চাঁদসুল্‌তানাকে বিজাপুর হইতে আনিতে পারা যায় তবেই এ বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া সম্ভব—নতুবা আর কাহারও সাধ্য নাই যে মোগলের হস্ত হইতে আহম্মদনগর রক্ষা করে! অবিলম্বে বিজাপুরে এ সংবাদ যাইয়া পৌঁছিল। পিতৃরাজ্যের মহা বিপদ দেখিয়া চাঁদসুল্‌তানা আহম্মদনগরে আসিলেন। তখন তিনি পঞ্চাশবর্ষ বয়সের বিধবা—রাজকার্য্য, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিয়া জীবনের অপরাহ্নে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সাহায্য

বাদশাহজাদা মুরাদ আসিয়া যখন আহম্মদনগর অবরোধ করিলেন তখন চাঁদ সুল্‌তানা দুর্গরক্ষার ভার লইয়াছেন। সিংহিনী জননীর আহ্বানে আবার সিংহশাবকদিগের হৃদয়ে সাহস আসিয়াছে, বাহুতে বল আসিয়াছে, প্রাণে ভরসা আসিয়াছে। দিনের পর দিন মোগলের আরক্তিম গোলা আহম্মদনগরের প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। গোলকুণ্ডা এবং

বিজাপুরের সুল্‌তানগ দেখিলেন যদি আজ আহম্মদনগর মোগলের করায়ত্ব হয়, তবে কালই তাহার কামানের গোলা বিজাপুরে এবং পরদিন গোলকুণ্ডায় পতিত হইবে এবং পরিশেষে দক্ষিণাপথের মুসলমান স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা হইতে সেনা দল আসিয়া চাঁদ সুল্‌তানার সহায় হইল।

নারীর শৌর্য্য

মুরাদ দেখিলেন দুর্গ জয় করিতে না পারিলে এত শ্রম সবই বিফল হইবে। তিনি বহু পরিশ্রমে দুর্গ প্রাচীরের পাঁচটা স্থানে রন্ধ্র করিলেন। এবং রন্ধ্র মধ্যে বারুদ রাখিয়া আসিলেন। স্থির হইল পরদিন প্রভাতে সেই সকল স্থানে অগ্নি দিলেই দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে! রাত্রিতে যখন এই সংবাদ যাইয়া চাঁদ সুল্‌তানার নিকট পৌঁছিল, তিনি তখনই গুপ্তবারুদের কোটরের সন্ধান আরম্ভ করিলেন। বহু চেষ্টার পর দুইটী কোটরের সন্ধান পাওয়া গেল। তথা হইতে বারুদ অপসৃত করা হইল। পরদিন যখন চাঁদ সুল্‌তান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তৃতীয় কোটর হইতে বারুদ সরাইবার আয়োজন করিতেছিলেন বাদশাহী সেনা তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা বারুদ সরাইতেছিল তাহারা আহত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত

হইল। বারুদে আগুন দিতে সমর্থ হওয়ায় বাদশাহী সেনা দুর্গ প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া দিল !

যাহারা দুর্গের সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল, বিপদ বুঝিয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হইবা মাত্র দেখিল বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিতা উলঙ্গ কৃপাণ করে স্বয়ং চাঁদ বিবি। পবন হিল্লোলে তখন তাঁহার সবুজবর্ণ মুখাবরণ নৃত্য করিতেছিল। পলায়মান সেনাগণ চমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরমুহূর্ত্তেই বিজয় গর্ব্বে হুঙ্কার দিয়া ভগ্ন প্রাচীরের সংস্কার করিতে লাগিয়া গেল। দুর্গ হইতে বৃষ্টির ধারার মত কামানের গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। বাদশাহী ফৌজ তখন আর অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাঁদ সুল্‌তানা স্বয়ং ভগ্ন প্রাচীর সংস্কৃত করিলেন। ইহার মধ্যে বাদশাহী সেনা কত বার প্রাচীরের ভগ্নপথে দুর্গে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিলনা। চাঁদ সুল্‌তানার নেতৃত্বে সে দিন আহম্মদনগরের সেনাগণ প্রত্যেকে এক এক সহস্র হইল—তাহারা সেদিন মৃত্যুকে ভয় করিলনা—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গভীর দুর্গ পরিখা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! কামান গর্জ্জনেরও উর্দ্ধে কণ্ঠ তুলিয়া বীরপত্নী চাঁদসুলতানা নিজ সৈন্যদিগকে

উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার মুক্ত কৃপাণ তপন করে জ্বলিতে লাগিল। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে যখন যেদিকে চাহিল—সেই দিকেই দেখিল অসিকরে চাঁদ বিবি!

দুর্গের লৌহগোলা যখন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল চাঁদ বিবি তখনো নিরস্ত হইলেন না। তিনি রূপা গলাইয়া তাহারই গোলা কামানের মুখে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিলেন। রূপাও যখন ফুরাইল, তখন তাম্র ও স্থবর্ণ মুদ্রা গুলির মত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাও যখন ফুরাইল তখন চাঁদ বিবি রাজপরিবারের ভূষণাদি লইয়া কামানের গোলার কার্য্য করিলেন। বাদশাহজাদা মুরাদ বীর রমণীর অসাধারণ শৌর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ তাঁহাকে স্থলতানা আখ্যায় বিভূষিত করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। মোগলের সহিত আহম্মদনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সেই সন্ধির ফলে বেরার সম্রাট প্রদেশ আকবরের অধিকৃত জনপদ রূপে পরিগণিত হইয়া গেল।

মোগল সৈন্য দেশ ত্যাগ করিতে না করিতেই আহম্মদনগরে আবার বিদ্রোহ দেখা দিল এবং তাহারই

চাঁদসুলতানার মৃত্যু

স্বযোগে মোগল সেনা আবার আহম্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করিল। এবার গোদাবরী তীরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই বীরের অভাব ছিল না। বীরগণ প্রত্যেকেই যথা সাধ্য শৌর্য্যের পরিচয় দিলেন। কত রাজ-

চাঁদ সুলতানার মৃত্যু।

পুত বীর এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন! শেষে মোগলদিগের জয় হইল বটে, কিন্তু বহুমূল্যে এই জয় ক্রয় করিতে হইল! আহম্মদনগরের সেনা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চাঁদ স্বলতানা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে মন্ত্রী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি মন্ত্রীকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আহম্মদনগরের অন্তর্বিদ্রোহ ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। সেই স্বযোগে মোগল সেনা আসিয়া হানা দিল—আহম্মদ নগর পুনরায় অবরুদ্ধ হইল। চাঁদ স্বলতানা দেখিলেন, দুর্গের সেনাগণ পূর্ব্বের মত উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করে না —তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে বিদ্রোহী। তিনি তাই মোগলের সহিত সন্ধি করাই স্থির করিলেন। স্বলতানার বিরুদ্ধদল এই কথা জানিতে পাইয়া রটনা করিল যে তিনি আহম্মদনগরকে মোগলের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র নাগরিকগণ

উন্মত্ত হইয়া উঠিল—সত্য যে কি, তাহার অনুসন্ধানে কেহই প্রবৃত্ত হইল না। উন্মত্ততা তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিল। তাহারা ঝড়ের বেগে দুর্গে প্রবেশ করিয়া চাঁদ সুলতানাকে হত্যা করিল!

চাঁদসুলতানা নাই, কে আর দুর্গ রক্ষা করিবে—চাঁদ-সুলতানা নাই কে আর সকলের অগ্রে অসি হস্তে অগ্রসর হইবে—চাঁদসুলতানা নাই কে আর সৈনিকদিগের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ আনিয়া দিবে—কে আর বিরোধে বিচ্ছিন্ন হিংসায় দুর্ব্বল শক্তিপুঞ্জকে মিলিত করিয়া দেশের শত্রুর সম্মুখীন করিবে! কয়েকদিনের মধ্যেই তাই মোগল সেনা আহম্মদনগর জয় করিল—তাহার রাজকোষ লুণ্ঠন করিল—তাহার সুলতানকে ধৃত করিয়া বন্দীরূপে সম্রাট আকবরের নিকট প্রেরণ করিল। এত দিনে (১৫৯৯ খৃঃ অঃ) দক্ষিণাপথে মোগলের জয়পতাকা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়া গেল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন মুসলমানরাজ্য

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও আহম্মদ নগর

সম্রাট আকবর যদিও আহম্মদনগর অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজাম শাহী রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই। মোগল সেনা প্রস্থান করিলে পর দেশের প্রধান নায়ক মালিক অম্বর ছিন্ন ভিন্ন রাজ্যকে পুনর্গঠন করিবার আয়োজন করিলেন। বেরারের অধিকাংশ, সুবা আউরঙ্গাবাদ এবং আরও কতিপয় জনপদ লইয়া নিজামশাহী রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মালিক অম্বর এই সুবিস্তৃত দেশের রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজ নামে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর শাসন ব্যবস্থায় আহম্মদনগর রাজ্যে আবার সমৃদ্ধির শ্রী ফুটিয়া উঠিল। এই সময়ে দিল্লীর রাজসিংহাসনকে বেড়িয়া সম্রাটপুত্র খস্রু যে বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই সুযোগে

মালিক অম্বর আহম্মদনগর রাজ্যকে আবার স্বাধীন করিয়া তুলিলেন। দিল্লীরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর আহম্মদনগর জয় করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শেষে পুত্র খুরম্‌কে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। খুরমের সহিত বহু বাদশাহী সেনা আসিয়া নিজামশাহী রাজ্য আক্রমণ করিল। মালিক অম্বর নিরুপায় হইয়া খুরমের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। দাক্ষিণাত্যে জয় লাভ করিয়া সম্রাটপুত্র খুরম্ যখন দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন পরম পরিতুষ্ট বাদশাহ তাঁহাকে সাজাহান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট সাজাহান ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা খান্‌জাহান

পরবৎসর (১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে) 'সাজাহান' যখন বিদ্রোহী হইলেন তখন মালিক অম্বর তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দিল্লী সাম্রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার সুবিধা লইয়া মালিক অম্বর নবীন জনপদ জয় করিয়া আহম্মদনগরকে শ্রীশালিনী করিতেছিলেন। দৌলতাবাদ প্রাচীনকালের দেবগিরি। দেবগিরির সে দুর্গের উপরাংশ শৈলশিখরে অবস্থিত ছিল। দুর্গপাদ-মুল হইতে ভূমিতল পর্য্যন্ত,—পর্ব্বতগাত্র [illegible]রূপ ভাবে

কাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছিল যে মানুষত দূরের কথা, পিপীলিকা পর্য্যন্ত সহজে আরোহণ করিতে পারিত না! পর্ব্বতের গুপ্ত স্থান দিয়া ক্ষুদ্র সোপান শ্রেণী দুর্গমুখে প্রসারিত ছিল। দুর্গপ্রবেশের এই পথ স্থানে স্থানে এমন নিবিড় অন্ধকার যে দিবসে পর্য্যন্ত আলোক প্রয়োজন হইত। এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকিতেও নিজামশাহী রাজ্য মোগল কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল।

খান্‌জাহানের পলায়ন

সম্রাট সাজাহান যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন খান্‌জাহান্ তাঁহার অধীনে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খান্‌জাহান্ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আহম্মদনগরের প্রধান নায়ক মালিক অম্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্রাট যখন একথা শুনিলেন তখন খান্‌জাহান্‌কে কোন প্রকারে দক্ষিণাপথ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিলেন। আয়োজনও হইল, খান্‌জাহান্ সম্রাটের মিথ্যা বাক্যে ও আদর আপ্যায়নে ভুলিয়া দিল্লীতেও আসিলেন—কিন্তু সম্রাটের মনের ভাব বুঝিবামাত্র তিনি নিশাযোগে সসৈন্যে দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন। সম্রাটের রোষ খান্‌জাহানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল! খান্‌জাহান্ আহম্মদনগরে গেলেন কিন্তু আশ্রয় লাভের সুবিধা হইল না। তিনি তথা হইতে বিজাপুরে গেলেন।

বিজাপুরের সুল্‌তান দিল্লীর সহিত শত্রুতা করিতে চাহিলেন না। নিরুপায় খানজাহান্‌ আবার আহম্মদনগরে আসিলেন এবং শেষে পঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

ইহার পূর্ব্বেই মালিক অম্বরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুল্‌তান মর্ত্তেজা তাঁহার প্রথম পুত্র ফতেখাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজেই আহম্মদনগরের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দাক্ষিণাত্যে তখন এই তিনটী মুসলমান রাজ্যই ও প্রবল ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল আহম্মদনগর। দিল্লীর রাজনৈতিক গোলযোগের আশ্রয়ে এই তিনটী রাজ্য তখন পুনঃরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। মোগলের অধিকার তখন মাত্র খান্দেশে ও বেরারে বর্ত্তমান ছিল। সুল্‌তান মর্ত্তেজা তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিবা-রাত্রি ব্যসনেই ব্যস্ত ছিলেন। ফতেখাঁ নানা চেষ্টার পর কারামুক্ত হইয়া সেনাপতির পদ লাভ করিলেন এবং অবিলম্বে দিল্লীর সম্রাট-দরবারের ইঙ্গিতে সুল্‌তানকে হত্যা করিলেন। হত্যার পরই ফতেখাঁ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি মহাপাপ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন—দিল্লীর সম্রাট কিছুতেই তাঁহাকে স্বাধীন হইতে দিবেন না। ফতেখাঁ

আহম্মদনগরের সুবিখ্যাত দুর্গ দৌলতাবাদ

তখন সুলতান মর্ত্তেজার বালক-পুত্র হুসেনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুবিখ্যাত মোগল সেনাপতি মহব্বতখাঁ তখন বহু সেনা লইয়া দৌলতাবাদ দুর্গ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বিজাপুরের সেনা ফতেখাঁর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। শিবাজীর পিতা মহারাষ্ট্রবীর শাহাজীও বিজাপুরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই মিলিত বাহিনি মহব্বত-খাঁর গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি দৌলতাবাদ দুর্গ অবরোধ করিলেন। দীর্ঘ দিনের যুদ্ধের পর ফতেখাঁ যখন দেখিলেন যে দুর্গ আর রক্ষা করা যাইবে না, তখন তিনি উহার চাবি মহব্বতকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। এই ঘটনার পর দিল্লীর বাদশাহ ফতেখাঁকে রাজসম্মান ও অর্থ দান করিতে ত্রুটী করেন নাই দেখিয়া মনে হয়, ফতেখাঁ মোগলের চরণে আহম্মদনগর রাজ্যটা বিক্রয় করিয়াছিলেন। দৌলতাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ধ্বংশ হইবার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

যদিও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলি ধনে জনে, সৌভাগ্যে ও সম্পদে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়ছিল বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে একেবারে উৎখাত করিতে পারে

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজা

নাই। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তখনো হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল বটে, কিন্তু সে সকল রাজ্য ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। হিন্দুগণ তখন দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যে শ্রেষ্ঠ অমাত্য হইতেন। শাহাজি ভোঁসলা এই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আহম্মদনগরের যাহাতে পতন না ঘটে সে জন্য তিনি বিবিধ চেষ্টাও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া শেষে বিজাপুর সুলতানের অধীনে কার্য্য লইয়াছিলেন। শাহাজির দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিবাজী। ইনিই মহারাষ্ট্র রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শিবাজী

শিবাজী লেখা পড়া জানিতেন না। তাঁহাকে বিদ্বান্ করিবার জন্য কেহ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু দাদাজির শিষ্যত্বে থাকিয়া শিবাজী সুদক্ষ অশ্বারোহী ও অসাধারণ যোদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি একটা অখণ্ড হিন্দু রাজ্য স্থাপিত করেন। তাঁহার বাল্যকাল অশ্বারোহণে, মৃগয়ায় ও তাঁহার পিতার সেনাদিগের সহিত কাটিয়া গেল। এই সময়েই তিনি মহারাষ্ট্র দেশের প্রত্যেক গিরি, প্রতি গিরি পথ, প্রতি কানন প্রতি নদী উত্তম রূপে চিনিয়াছিলেন। যৌবনে যখন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে

জাগিয়াছিলল তখন তিনি দেখিলেন প্রথমেই কয়েকটী শৈল দুর্গ হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। উনবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি শৈল দুর্গ তোর্ণা অধিকার করিলেন, অল্পদিন মধ্যেই রায়গড় নির্ম্মিত হইল এবং আরও কতকগুলি পার্ব্বতী দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসিল। এই সকল দুর্গ বিজাপুরের সুলতানের ছিল। শিবাজী এমন কৌশলে সেগুলি করায়ত্ত করিলেন যে সুলতান তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না! তিনি মনে করিলেন এ সকল অস্বাস্থ্যকর দুর্গের ভার লইয়া কোন মুসলমান সেনাপতি থাকিতে চাহেন না! হিন্দু শিবাজী যদি এ গুলির তত্ত্বাবধান করে তবে মন্দ কি?

শিবাজী ও বিজাপুর

বল সঞ্চয় করিয়া শিবাজী প্রকাশ্যভাবে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। শিবাজীর পিতা শাহাজি তখনো বিজাপুরের একজন সন্নাসীর অমাত্য ছিলেন। বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া একটা দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কহিলেন, যদি সেই দিনে শিবাজী ধরা না দেন তাহা হইলে শাহাজিকে হত্যা করা হইবে। এই সংবাদ শুনিয়া শিবাজী সম্রাট শাজাহানের স্মরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট ভাবিলেন, ভালই হইল, এই সুযোগে

বিজাপুর অধিকার করা যাইবে। পাছে বাদশাহ সসৈন্যে আসেন এই ভয়ে বিজাপুরপতি শাহাজীকে মুক্তি দিয়া কর্ণাটিক প্রদেশে তাঁহার জন্য জায়গির নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শিবাজী যখন দেখিলেন যে তাঁহার পিতার আর বিপদের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি পুনরায় নব নব রাজ্য জয় করিতে মন দিলেন। বিজাপুরের সুলতান যখন কিছুতেই শিবাজীর সহিত পারিয়া উঠিলেননা—বিজাপুরের প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁ যখন শিবাজীকে হত্যা করিতে যাইয়া নিজেই নিহত হইলেন, তখন শিবাজীর সহিত বিজাপুরের সন্ধি হইল। শিবাজী তখন গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মোগলের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পর সন্ধি হইয়া গেল।

আরাংজেব ও শিবাজী

বহুদিন হইতেই আরাংজেবের ইচ্ছা ছিল যে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মোগলের শাসনাধীনে আসে। তিনি যখন দিল্লীর একজন শাসন কর্ত্তা স্বরূপ দাক্ষিণাত্যে বাস করেন সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিতে নানা চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট শাজাহান পীড়িত হইলে তাঁহাকে

সিংহাসন লাভের চেষ্টায় ত্বরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এখন শিবাজীর সহায়তায় আরাংজেব বিজাপুর জয় করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমে নানা যুদ্ধে মোগলের জয় হইল। শিবাজীর বীর-পণায় তুষ্ট হইয়া আরাংজেব তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। আরাংজেবের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, যে কোনো প্রকারে শিবাজীকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিবেন। আরাংজেবের নিমন্ত্রণে শিবাজী দিল্লীতে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কুচক্র বুঝিতে পারিয়াই কৌশলে পলায়ন করিলেন।

শিবাজীর পলায়নের কিছুদিন পরই কারারুদ্ধ বৃদ্ধ সম্রাট শাজাহানের মৃত্যু হইল। তখন দিল্লী-সাম্রাজ্যের অবস্থা অতিশয় শ্রীসম্পন্ন ছিল। সম্রাট আরাংজেব দেখিলেন কেবল দক্ষিণাপথেই মোগলের অধিকার সেরূপভাবে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে নাই। তখনো বিজাপুর শির তুলিয়াই ছিল, গোলকুণ্ডার খণির হীরক তখনো তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করে নাই। রাজপুত বীর জয়সিংহ তখনও বিজাপুরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! খাদ্যাভাবে তাঁহার সেনা তখন আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এদিকে আবার গোলকুণ্ডার

রাজা জয়সিংহ
ও
বিজাপুর

সেনা আসিয়া বিজাপুর বাহিনীর সহিত মিলিত হইল। সম্রাট আরাংজেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া রাজা জয়-সিংহকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। শাহজাদা মোয়াজ্জিম দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ভার পাইয়া জয়সিংহের স্থান অধিকার করিলেন। সঙ্গে চলিলেন সসৈন্যে যশোবন্ত সিংহ। সেকালে যশোবন্তও একজন অসাধারণ যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চতুর আরাংজেব ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া মোগল বীর দিলিরখাঁকেও সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

আরাংজেব ও বিজাপুর

পরিশেষে যখন আরাংজেব দেখিলেন যে এত করিয়াও দাক্ষিণাত্য বিজয় ঘটিতেছে না, মহারাষ্ট্রদেশ করায়ত্ত হইতেছে না, তখন তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন যদিও মধ্যে মধ্যে বিজাপুরের সহিত গোলকুণ্ডার মিলন হইতেছে—উভয়ে একত্র হইয়া কখনো মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, কখনো বা মোগলের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতেছে কিন্তু সুযোগ পাইলেই বিজাপুর গোলকুণ্ডার এবং গোল-কুণ্ডা বিজাপুরের কণ্ঠ কাটিবার জন্য প্রস্তুত। তিনি দেখিতেছিলেন যদিও সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্রগণ বিজাপুরকে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাহারা বিজা-

পুরকে ধ্বংশ করিবে, অথবা বিজাপুর মহারাষ্ট্রদিগকে উৎখাত করিবে। তবে ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কি বিজাপুর, কি গোলকুণ্ডা, কি মহারাষ্ট্র সকলেই মোগলের শত্রু। তিনি তাই প্রথমে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মুখে প্রকাশ করিলেন যে বিধর্ম্মী মহারাষ্ট্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন। সম্রাটের পুত্রবধূ শহরবানু পর্য্যন্ত বিজাপুরের সেনাপতির নিকট লিখিলেন—বাদশাহী ফৌজ যাইতেছে। ইহাদিগকে সাহায্য করিও। তাহাতে বিজাপুরের কল্যাণ হইবে। সকলে মিলিত হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে জয় কর। বিজাপুরীগণ নীরব রহিল। তাহারা কি করিবে সম্রাটকে জানিতে দিল না।

স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সম্রাট আরাংজেব বিজাপুর রাজ্যের প্রান্তদেশে নানাস্থানে মোগল সেনার ছাউনী পাঠাইলেন। সকলকেই আদেশ করিলেন, যদি আর কিছুও না পার, তবে বিজাপুর রাজ্যের যতটা পার লুটপাট করিয়া ধ্বংশ কর!

বন্ধুতার ছদ্মবেশ

বিজাপুরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অতিশয় শোচনীয় ছিল। পথের ভিখারী হইতে দুর্গের অধিপতি পর্য্যন্ত কেহই একটী দিনও নিশ্চিন্তে কাটাইতে পারিতনা—

সকলেই তখন সকলকে অবিশ্বাস করিত, সন্দেহ করিত। উজীর মাসুদ দেখিলেন বিজাপুর দরবারে থাকিয়া আর লাভ নাই। বরং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই কর্ত্তব্য! উজীর তাই অবিলম্বে রাজধানী ত্যাগ করিলেন! নূতন উজীর দরবারে প্রবেশ করিতে না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এদিকে দুর্দ্ধর্ষ মোগল তখন বিজাপুরের সিংহদ্বারে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সম্রাট আরাংজেবের বন্ধুতার ছদ্মবেশ খুলিয়া পড়িল! বিজাপুরের সেনাপতি লর্জাখাঁ দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহায্য ভিক্ষা করিয়া গোলকুণ্ডায় দূত গেল।

চারিদিকে সাজ সাজ রব উঠিল। শম্ভুজীর দেওয়ান নীলগিরি পণ্ডিত সাহসী মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া জয় জয় রবে বিজাপুরের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। গোলকুণ্ডা হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসিল।

বিজাপুর দুর্গ আক্রমণ

দেখিতে দেখিতে মোগলের সহিত যুদ্ধ বাধিল। বিজাপুরদুর্গ শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। মোগল বাদশাহ লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিজাপুরের সুবিখ্যাত গোল-গম্বুজ নীল আকাশের গায়ে হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে। মোগল সেনা ভীত চিত্তে দেখিল,

দুর্গের পশ্চিম দিকে শরজি বুরুজে প্রতিষ্ঠিত ভারতবিখ্যাত কামান মালিক-ই-ময়দান হইতে মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। লণ্ডকসব্ বুরুজ হইতে কামানের গোলা ছুটিতেছে—মোগলের গোলা, পর্ব্বততুল্য দৃঢ় ফিরাঙ্গী বুরুজের গায়ে লাগিয়া নক্ষত্রের মত ছুটিয়া পড়িতেছে। মোগল গোলন্দাজ তখন লণ্ডকসব্ বুরুজ আক্রমণ করিল। গোলার আঘাতে বুরুজ ঝাঁঝর হইয়া পড়িল এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গ প্রাকারের একটী স্থান ভাঙ্গিয়া গেল। বিজাপুরীগণ উহা গ্রাহ্য করিল না। দুর্গ মধ্যে ত্রিশ সহস্র বিজাপুরী সেনা তখন ভৈরব হুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ত্রিশ সহস্র সেনা দুর্গের বাহিরে থাকিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিল এবং মোগল-অধিকৃত পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য ধ্বংশ করিতে লাগিল। মোগল সম্রাট ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনটী ভীষণ যুদ্ধে বহু মোগল সেনা ও সেনানায়ক নিহত হইলেন—বাদশাহজাদার বারুদখানায় আগুন লাগিয়া বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়া গেল। বিজাপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বার বার লুণ্ঠিত হওয়ায় খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইয়া পড়িল। চতুর মহারাষ্ট্র সেনা চারিদিকের পথ ঘাট এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিল যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মোগল ছাউনীতে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল।

যাহা কিছু চাউল ছিল তাহা প্রতি সের ১৫৲ টাকা দরে বিক্রীত হইতে লাগিল। বাদশাহ প্রমাদ গণিলেন। সেনাপতিগণ একবাক্যে কহিতে লাগিলেন—আর কাজ নাই—এখনো সময় আছে—এখনো ফিরিতে পারা যায়। বাদশাহজাদা আজম কহিলেন—যদি ফিরিতে হয়, আপনারা ফিরুন, আমার দুইটী পুত্র ও পত্নীকে লইয়া আমি এখানেই থাকিব—একপদও হটিব না! আমার মৃত্যু হইলে পর সম্রাট আসিয়া যখন আমার মৃতদেহ সমাহিত করিবেন—তখনই শুধু-তখনই আমার দেহ এই স্থান ত্যাগ করিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। বাদশাহজাদার এই বীরত্বপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মন্ত্রণাসভার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেনাপতিগণ সমস্বরে কহিলেন—"তবে তাহাই হউক—আমরাও যাইব না।'

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একে একে সুদীর্ঘ ১৫টা মাস কাটিয়া গেল—মোগল সেনা যেমন দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল, তেমনি অবরোধ করিয়াই রহিল—বিজাপুরীগণ যেমন যুদ্ধ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। সম্রাট আরংজেব গোলাপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। সকল অবস্থা শুনিয়া তিনি কহিলেন—'না—আর না। আমি নিজেই যুদ্ধ

সম্রাট আরংজেবের যুদ্ধস্থলে আগমন

করিব। ভাবিয়াছিলাম আমার পুত্রদের মধ্যে কেহ দুর্গ জয় করিয়া যশস্বী হইবে—কিন্তু তাহা আর হইল না।' সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মোগল সেনা চতুর্গুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

মোগলের বিক্রম

দিনের পর দিন মোগল সেনা দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—বিজাপুরের শেষ মুহূর্ত্ত দিনের পর দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিজাপুরের দুর্গ, দুইটী বিশালকার প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। প্রথম প্রাচীরের সম্মুখেই গভীর পরিখা—উহা প্রায় ৩০।৩৩ হস্ত প্রশস্ত। দুর্গ-প্রাচীর ২০ হইতে প্রায় ৬০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার বেধ ১৩।১৪ হস্ত। একটা দুইটা নয়—৯৬টী সুড়ঙ্গে সেই দুর্গ রক্ষা করিত। দুর্গের প্রবেশ-পথে আরও দশটী সুড়ঙ্গ স্থাপিত ছিল। দুর্গ-প্রাচীরের শিরোভাগে আত্মরক্ষার্থ যে প্রাচীর ছিল, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং প্রায় ছয় হস্ত পরিমিত উচ্চ। প্রাচীর গাত্রের ছিদ্র পথে বন্দুক বা কামান ছোঁড়া হইত। মোগল সেনা প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া শম্বুকের ন্যায় অল্পে অল্পে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। খুব নিকটে আসিয়া যখন তাহারা দেখিল যে একটা বিস্তীর্ণ

পরিখা পথ রোধ করিয়াছে, তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। যে সেনা পরিখার নিকটে আসিতে লাগিল, বিজাপুরী গোলন্দাজ তৎক্ষণাৎ কামানের গোলায় তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। সম্রাট ঘোষণা করিলেন, পরিখায় এক ঝুড়ি মাটী ফেলিতে পারিলেই চারি আনা পুরস্কার মিলিবে। অনেকে মাটী ফেলিতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু বিজাপুরী কামানের গোলা বৃষ্টির ধারার ন্যায় তাহাদের শিরে বর্ষিত হইতে লাগিল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কে প্রবেশ করিতে চাহে ? যাহারা মাটী ফেলিতেছিল, তাহারা পলায়ন করিল। সম্রাট কহিলেন চারি আনা নহে, প্রত্যেক ঝুড়ির জন্য এক টাকা! কেহই অগ্রসর হইল না। পাঁচ? দশ? তবুও কেহ অগ্রসর হইল না। সম্রাট শেষে কহিলেন—এক ঝুড়ির জন্য একটী করিয়া মোহর দিব!

মোহরের লোভে সেনাগণ দলে দলে অগ্রসর হইল—দলে দলে মাটী ফেলিয়া পরিখার খানিকটা অংশ পূর্ণ করিতে লাগিল। যাহারা মরিল, তাহাদের মৃতদেহ পর্য্যন্ত সেই পরিখা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পরিখা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মোগলের গোলায় শত্রুর ত্রিশ সহস্রের মধ্যে তখন মাত্র দুই সহস্র সেনা

জীবিত ছিল। বিজাপুরের সুলতান সিকান্দার দেখিলেন সবই ত গিয়াছে, এই মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট সেনা বধ করিয়া কি ফল হইবে—বরং পরাজয় স্বীকার করাই ভাল। সম্রাটের নিকট তখন সেই সংবাদ প্রেরিত হইল (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ)।

পরদিন মধ্যাহ্নে রোরুদ্যমান নগরবাসিগণ পথের উভয় পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। বিজাপুরের শেষ স্বাধীন সুলতান নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে—দুর্গের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদে শাহী দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং সম্রাটের নিকটে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য রসুলপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিজাপুরের পতন ঘটিল। বৃহৎ পটাবাসে তখন দরবার বসিয়াছিল। আমির ওমরাহগণ, মনসবদারগণ এবং অন্যান্য সকলে সশস্ত্র আসিয়া সভামণ্ডপে আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। উপযুক্ত সময়ে রৌপ্য-শৃঙ্খলবদ্ধ বিজাপুরপতি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া আনত নেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। আরাংজেব বিজিত সুলতানের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশায় তাঁহারই হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হইল। সম্রাট ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন—'ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আত্মসমর্পণ করিয়া বুদ্ধিরই কার্য্য করিয়াছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দরবার

আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাকে বহু উপঢৌকন ও খেলাৎ দিয়া ভূষিত করিব।"

স্থুল্তানের বন্ধন-শৃঙ্খল মুক্ত করা হইল। সম্রাট সমাদরে সুলতানের কর ধরিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী রাজোচিত বেশ তাঁহাকে দান করিলেন। সম্রাটের আদেশে ৭ হাজার টাকা মূল্যের মণি মুক্তা খচিত একখানি ছোরা এবং হীরক ও বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত তের হাজার টাকা মূল্যের একটী হার, একটী কলগি বা শিরোভূষণ এবং রাজদণ্ড সুল্তানকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত হইল। সুল্তান সিকানা সম্রাটের আদেশে খাঁ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। তাঁহার ভাতা বৎসরে এক লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

বিজাপুর চিরদিনের জন্য অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

বিজাপুরের সুল্তানকে সাহায্য করিবার জন্য সম্রাট আরাংজেব গোলকুণ্ডার সুল্তানের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। বিজাপুরের পতনের পরই বিজয়ে উৎফুল্ল মোগল সেনা গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ করিবার অভিলাষে ভীমার উত্তর তীর ধরিয়া বীর বিক্রমে যাত্রা করিল। অগ্রসর হইতে হইতে

গোলকুণ্ডা আক্রমণ

তাহারা যখন মলক্‌হেড নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইল তখন দেখিল ৪০ হইতে ৮০ সহস্র সেনা তাহাদের পথ রোধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে সেনাপতিদিগের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় গোলকুণ্ডার সেনাপতি রণস্থল ত্যাগ করিলেন এবং একেবারে মোগল শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন সেনাপতি মোগলের অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছায় এইরূপে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন।

প্রধান সেনাপতিকে রণস্থল ত্যাগ করিতে দেখিয়াই সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হইল। সুল্‌তান আবুল্‌ হুসাণ ভাবিলেন যখন প্রধান সেনাপতিই অবিশ্বাসী, তখন না জানি আরও কতজন এরূপ আছেন। সুলতানের এত শক্তি ছিল না যে তিনি তাঁহার পলায়মান সেনাদিগকে আবার সম্মিলিত করিতে পারেন। তিনিও তখন আত্মরক্ষার জন্য গোলকুণ্ডা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ধনরত্ন যাহা কিছু সঙ্গে ছিল, তিনি সে সকলও লইয়া যাইবার অবসর পাইলেন না। যখন রাজনগরী হায়দ্রাবাদ এইরূপে পরিত্যক্ত হইল, তখন মোগলের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকে গোলকুণ্ডা দুর্গাভিমুখে ছুটিল। যাহারা কোনো দিন পদব্রজে পথ চলে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত সেদিন স্ত্রীপুত্রের

হস্ত ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রপদে দুর্গের দিকে ছুটিল। দস্যুগণ সুবিধা পাইয়া চারিদিকে অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া একটী বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

পথে পথে দস্যুরা ফিরিতে লাগিল—বাজারে বাজারে তাহারা হুঙ্কার দিতে লাগিল—লক্ষ লক্ষ মুদ্রার ধনরত্ন মুহূর্ত্তে বিলুণ্ঠিত হইল। অশ্ব, হস্তী, তৈজস পত্র, গালিচা প্রভৃতি যে যাহা পাইল লইয়া গেল। কত হিন্দু ও মুসলমানের স্ত্রী ও কন্যাকে চুরি করিয়া দস্যুগণ কানন অভ্যন্তরে প্রস্থান করিল। হায়দ্রাবাদ নগরী তখন দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। দেখিতে দেখিতে উহা শ্মশানে পরিণত হইল। শাহজাদা শাহ আলম নগর রক্ষার জন্য মোগল সেনা প্রেরণ করিলেন। যাহারা আসিল তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ধনরত্ন লুঠিতে লাগিল!

গোলকুণ্ডা দুর্গ

রাজধানী হায়দ্রাবাদের সন্নিকটে মুসী নদীর উপর একটা বৃহৎ প্রস্তর সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সপ্তদশ শতাব্দীর স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রস্তর-সেতুর এক ক্রোশ পশ্চিমে মুসীর উত্তর তীরে গোলকুণ্ডা দুর্গ। দুর্গ-প্রাচীর দুই ক্রোশ বিস্তৃত এবং সুদৃঢ় পাষাণে গঠিত। অর্দ্ধবৃত্তাকার ৮৭টী বুরুজ সেকালে এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে

রক্ষা করিত। প্রত্যেকটা বুরুজ ৩০ হইতে ৭০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং সুদৃঢ় প্রস্তর দ্বারা গঠিত। দুর্গ প্রবেশের আটটী দরওয়াজা বা বৃহৎ সিংহ দ্বার আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কামানের এত শক্তি ছিল না যে সেই সকল সিংহদ্বার ভাঙ্গিতে পারে, দুর্গপ্রাকার চুর্ণ করিয়া প্রবেশের পথ খুলিতে পারে। প্রাসাদের বাহিরে ৫০ ফিট প্রশস্ত গভীর পরিখা অতিক্রম করাই সেকালে অসাধ্যসাধনরূপে পরিগণিত হইত। বলিতে গেলে, চারিটী বিভিন্ন দুর্গ, প্রাচীরে ঘিরিয়া গোলকুণ্ডা দুর্গ নামে পরিচিত করা হইয়াছিল। বালা-হিসার বা সর্ব্বোচ্চ দুর্গই তখন গোলকুণ্ডা দুর্গের মধ্যমণি রূপে পরিগণিত হইত। চরম বিপদ উপস্থিত হইলে গোলকুণ্ডাপতি এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইতেন।

গোলকুণ্ডার নিকটবর্ত্তী হইয়া (১৬৮৭ খ্রীঃ অঃ) সম্রাট আরাংজেব আক্রমণের আদেশ দিলেন। কুতুবসাহা সেনা তখন দুর্গ প্রাকারে স্থাপিত কামান-শ্রেণীর আশ্রয়ে দুর্গ-পরিখার শুষ্ক গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রথম নিজামের পিতামহ কোয়ালিশ খাঁ মনে করিলেন আক্রমণ মাত্রেই অরাতি-সৈন্য পলায়ন করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা

বীর কোয়ালিশ খাঁ

ঘটিল না। জাম্বুরকের গুলির আঘাতে কোয়ালিশখাঁর স্কন্ধের অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার সেনা রণে ভঙ্গ দিল। কথিত হয় যে পরে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া ভগ্ন অস্থিগুলি বাহির করিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারের কালে বীর কোয়ালিশখাঁ একটীবারও কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। চিকিৎসক যখন ছুরি চালাইতেছিলেন, আহত-বীর তখন স্বচ্ছন্দে কাফি পান করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন! সুনিপুণ চিকিৎসাতেও কোনো ফল হইল না। কোয়ালিশখাঁ অল্পকাল পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া সম্রাট গোলকুণ্ডা দুর্গ অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট আকবর এবং সাজাহান কতদিন মানস নয়নে দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণাপথের নগরে নগরে, মোগল পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, মসজেদে মসজেদে মোগলের কল্যাণ কামনায় খুৎবা পঠিত হইতেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে পারেন নাই। সম্রাট আরাংজেব সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া

শাহজাদা শাহ আলম

কাননে কান্তারে, শৈলে প্রান্তরে কত যুদ্ধে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা জয় করিতে পারিলেই তাঁহার কত দিনের আশা পূর্ণ হইতে পারে—অথচ তাঁহারই পুত্র শাহ আলম কিনা তাঁহার বিরোধী! পুত্র চাহেন, অরাতির সহিত সন্ধি! সম্রাট জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন—সন্ধি নহে, জয়। গোলকুণ্ডার অধিপতি, হউন না কেন মুসলমান, তাঁহাকে নির্ম্মূল করিতেই হইবে! শাহ আলম দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া জয় হইলে, সে জয়ের গৌরব প্রধান সেনাপতি ফিরুজ-জঙ্গেরই হইবে, তাহাতে তাঁহার লাভ কি? অথচ তিনি যদি সন্ধি ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে গোলকুণ্ডা বিজয়ী বলিয়া তাঁহার নামেই রাজপ্রশস্তি ঘোষিত হইবে। গোলকুণ্ডাপতি আবুল্ হাসান সুযোগ বুঝিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাহ আলমের নিকট গুপ্তচর ও বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পাঠাইতে লাগিলেন। সাহজাদা শাহ আলম জানিতেন না যে তাঁহার শিবির গৃহ শত্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার অনাদৃতা উপেক্ষিতা বেগমেরাই তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছিলেন। ইহার কারণও ছিল। শাহজাদা তাঁহার হৃদয় ও সর্ব্বস্ব বেগম নুরউন্নিসার চরণতলে অর্পণ করিয়া-

ছিলেন! শাহজাদার গৃহশত্রুগণ অবিলম্বে সম্রাটের নিকট সকল গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। বেগমগণ প্রচার করিলেন যে শাহ আলমের চোখের মণি নুর-উন্নিসা বেগমই ছদ্মবেশে গোলকুণ্ডাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির অয়োজন করিতেছেন। এবং ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে সম্রাট সন্ধি না করিলে শাহ আলম স্বয়ং সসৈন্যে গোলকুণ্ডাপতি আবুল্ হাসানের সহিত যোগদান্ করিবেন! সন্ধির কথাবার্ত্তায় পূর্ণ একখানি পত্র লইয়া যে গুপ্তচর গোলকুণ্ডাপতির নিকট যাইতেছিল, একদিন সে পত্রসহ ধরা পড়িল। সম্রাটের রোষানল ভষীণভাবে জ্বলিয়া উঠিল। অবিলম্বে পুত্রকে সপরিবারে নিজ পটাবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সম্রাট সকলকেই বন্দী করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। একদিন তাঁহারই আদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী হইয়া কারাবাসেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহারই আদেশে বিদুষী কন্যা জেব-উন্নিসা দিল্লীতে বন্দিনী—আর আজ তাঁহার শেষ পুত্রকেও বন্দী করিতে হইল! মনোবেদনায় অস্থির হইয়া সম্রাট ছুটিয়া পত্নীর নিকটে গেলেন এবং দুই করে নিজ জানুতে আঘাত করিতে করিতে কহিলেন—"হায়রে অদৃষ্ট! চল্লিশ বৎসর ধরিয়া

যাহাকে আপন হাতে ধরিয়া গড়িয়া তুলিলাম, আজ তাহাকেই ধরার ধূলায় নিক্ষেপ করিতে হইল।"

কুতুবশাহ সেনার সহিত মোগলের ভীষণ সমর চলিতে লাগিল। অজেয় দুর্গ গোলকুণ্ডা! মোগল সেনা কিছুতেই জয় করিতে পারিল না। প্রধান সেনাপতি ফিরুজ জঙ্গ একদিন নিশা-যোগে গোপনে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার দুইটী অনুচর যখন দেখিল বুরুজের প্রহরী শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, তখন সাবধানে মই আনিয়া দুর্গের প্রাচীরের গায়ে লাগাইল। মই ছোট ছিল। সেনাপতি রজ্জু মই বাঁধিয়া উঠিবার আয়োজন করিলেন। একটা কুকুর তখন দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়াইয়া প্রাসাদ মধ্যে ঝম্প দিবার পথ খুঁজিতেছিল, কারণ সেখানে অগণিত শবদেহ পড়িয়াছিল। বুভুক্ষিত সারমেয় উহা আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল। কয়েকজন লোক মই বহিয়া উঠিতেছে দেখিয়া কুকুরটা ভীত হইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারে কুতুবশাহী সৈন্যগণ ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, শত্রু আসিতেছে। মুহূর্ত্তে বন্দুকের মুখে গুলি ছুটিল—চারিদিকে নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটিল। মোগল

সে-হরফী বা তিনটি উপাধী প্রাপ্ত অমাত্য

সেনাগণ ভয়ে পলায়ন করিল! আবুলহাসান এই সংবাদ পাইবামাত্র কুকুরটাকে নিকটে লইয়া গিয়া উহার গলায় মণিমুক্তা খচিত মালা বাঁধিলেন এবং সোণালী কাজ করা আঙ্গ্-রাখা লইয়া উহার দেহ ঢাকিলেন। কুকুরটাকে নিরাপদ স্থানে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সোণার শিকল ব্যবহার করা হইল। মোগল সেনাপতি ফিরুজের তিনটী উপাধি ছিল—খাঁ, বাহাদুর এবং জঙ্গ। তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য গোলকুণ্ডাপতিও এই কুকুরকে তিনটী অলঙ্কার দিয়া (মণিমুক্তার মালা, সোণার কাজ করা অঙ্গাবরণ ও সোণার শিকল) কহিলেন, আজ হইতে এই কুকুর "সে-তব্কা" (তিনটী উপাধি প্রাপ্ত অমাত্য) হইল!

মোগল সেণার দুর্দ্দশা।

গোলকুণ্ডা দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল—অবরুদ্ধই রহিল। এদিকে মোগলসেনার খাদ্য ফুরাইল। পূর্ব্ব বৎসরে আদৌ বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া দক্ষিণাপথে ধান্যাদি শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—জোয়ারি এবং বাজরা প্রখর রৌদ্রে পুড়িয়া উঠিয়াছিল! অবিরত যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া কৃষকের শস্যক্ষেত্রগুলিও শস্যহীন অবস্থায় পতিত পড়িয়াছিল। দক্ষিণী এবং মহারাষ্ট্র সেনাগণ মোগলসেনার খাদ্য সম্ভার লুঠিয়া লইতে

লাগিল। তাহার পর এমন ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইল যে সেনাবাস পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতে বসিল! ইহার উপর দিনের পর দিন পরাজয়! বর্ষার বারিপ্রবাহে কামানের মৃণ্ময় বেদী গলিয়া গিয়া, কামানগুলি অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিল। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতে লাগিল। সেই বারি রাশির মধ্যে মোগল সেনাবাসগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রবল ঝড়ে কত মণ্ডপের ছাদ উড়িয়া গেল। মোগলসেনা আবরণ-হীন হইয়া দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিল, এবং বাধ্য হইয়াই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের জন্য নানাদিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সম্রাট্ আরাংজেব তবুও পশ্চাৎপদ হইলেন না। গোলকুণ্ডা জয় করিবার জন্য তিনি জীবন পণ করিলেন। গোলকুণ্ডাপতি আবুল্‌হাসান জানাইলেন যে তিনি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্রাট কহিলেন—"মিথ্যা কথা! সত্যই যদি আবুল্‌হাসান আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে জানাও, শিকলে হাত বাঁধিয়া এবং গলায় রজ্জু রাখিয়া তিনি যেন এখানে আসেন। তবে আমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব—নতুবা নহে!"

পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বারুদ ঢালিয়া দুর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সম্রাট স্বয়ং সকল বন্দোবস্ত করিলেন। প্রভাতে মোগল সেনা সারি দিয়া প্রান্তরে দাঁড়াইল—প্রাচীর ভাঙ্গিলেই জলের স্রোতের মত দুর্গে প্রবেশ করিবে। বারুদে নির্ম্মিত সলিতায় অনল সংযুক্ত হইল। সলিতার আগুন ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া বারুদ স্পর্শ করিল। পরমুহূর্ত্তেই ভীষণ শব্দ করিয়া শৈল-প্রান্তর বিদারিত হইয়া গেল এবং রাশি রাশি শিলাখণ্ড ছুটিয়া আসিয়া সহস্রাধিক মোগল সেনাকেই নিহত করিল। দুর্গ-প্রাচীরের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইল না। আবার অন্যস্থানে বারুদে আগুণ দেওয়া হইল। আবার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পাথর ছুটিল—পাথরের আঘাতে মোগল মরিল—দুর্গ ভাঙ্গিল না! কুতুবশাহী সেনার কামান ও বন্দুক বৃষ্টির ধারার মত গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। মোগল আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিল না। এইরূপে তৃতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। এদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী একে একে সবই খাইতে লাগিল। হায়দ্রাবাদ জনশূন্য হইয়া পড়িল। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হইল। মোগল শিবিরে মোগল সেনা অনাহারে

যুদ্ধকালে দারুণ দুর্ভিক্ষ।

মরিতে লাগিল। সে আর কত কবর দিবে! দেখিতে দেখিতে শবের রাশিতে নদীতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল! যে সকল সেনা তখনো জীবিত ছিল, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মৃত অশ্ব ও মনুষ্য খাইতে আরম্ভ করিল। যতদূর চক্ষু চলে, কেবল কবরের পর কবর, আর শবের পর শব মাঠ ঘাট ছাইয়া ফেলিয়াছে! সম্রাটের বহু সেনা এইরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া শেষে পলাইয়া গোলকুণ্ডাপতির স্মরণ লইল। সম্রাট আরাংজেব তখনো নিরস্ত হইলেন না! কহিলেন, হয় জয়—না হয় মৃত্যু!

বিশ্বাসহন্তা সর্দ্দার খাঁ।

পাঠান আবদুল্লা গণির দ্বিতীয় নাম ছিল সর্দ্দার খাঁ। তিনি বিজাপুরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। বিজাপুরের পতনের পরই মোগল সম্রাটের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিছুদিন পর মোগল পক্ষ ত্যাগ করিয়া সর্দ্দার খাঁ কুতুবশাহীর পক্ষ লইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই একজন প্রধান অমাত্য রূপে পরিগণিত হইলেন। দুর্গে থাকিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে আবুল হাসানের পতন সুনিশ্চিত তখন একদিন দুর্গের গুপ্তদ্বার খুলিয়া মোগল সেনাদিগকে প্রবেশ করিবার পথ দিলেন! সেই মুক্তপথে কতকগুলি সেনা দুর্গে যাইয়া একটী সিংহদ্বার খুলিয়া দিল। উন্মত্ত

মোগল সেইখানে শতে সহস্রে দুর্গের ভিতর ধাইয়া চলিল ! গোলকুণ্ডার পতন ঘটিল !

বিশ্বাস হন্তার চক্রান্তে গোলকুণ্ডা মোগলের করায়ত্ব হইল বটে, কিন্তু সেদিন কুতুবশাহী অশ্বারোহী বীর আব্দর রজাক যে প্রভুভক্তি ও সৌর্য্য-বীর্য্য দেখাইয়াছিলেন, বীরের ইতিহাসে সে কাহিনী সসম্ভ্রমে স্থান পাইয়াছে।

আব্দর রজাকের বীর চরিত

মোগল সেনাদিগকে আসিতে দেখিয়া আব্দর রজাক এক লম্ফে নিজের অশ্বে আরোহণ করিলেন। ঘোড়ার পিঠে জিন্ বাঁধিবার সময় হইল না। মুক্ত অসি হস্তে আব্দর রজাক শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মোগলের শির কাটিতে কাটিতে বালা হিসায়ের সিংহ দ্বারে যাইয়া পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার দেহের ৭০টী স্থান হইতে ঝর ঝর করিয়া রুধির ঝরিতেছিল, তখন তাঁহার একটী চক্ষু আহত হইয়াছে, কপোলের চর্ম্ম কাটিয়া এমনভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে যে আর একটী চক্ষুও ঢাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার অশ্বও তখন অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। আব্দর রজাক আর অশ্বচালনা করিতে না পারিয়া বল্গা ত্যাগ করিলেন। আহত অশ্ব আপন মনে যেদিকে ইচ্ছা পলায়ন করিল এবং তাঁহাকে

নাগিনাবাগের উদ্যান মধ্যে নিক্ষেপ করিল। জ্ঞানহারা মৃতপ্রায় আব্দর রজাক সমস্ত দিন সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। পরে লোকে তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গেল। সম্রাট আরাংজেব যখন এই বীরের কাহিনী শুনিলেন তখনই তাঁহাকে নিজের শিবিরে আনিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোলকুণ্ডা যতদিন অবরুদ্ধ ছিল, আব্দর রজাককে নিজের পক্ষে আনিবার জন্য সম্রাট ততদিন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারে নাই। শেষে যখন সম্রাট বলিয়াছিলেন, 'আব্দর রজাক, সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন কর—তোমাকে ছয় হাজারি মন্‌সবদার করিব', তখন ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া রজাক রাজদূতকে জানাইয়াছিলেন—"কড়বালায় যে ৭২ জন বিশ্বাসী অনুচর খলিপা হাসানের সঙ্গে জীবন দিয়াছিলেন, আমি বরং তাঁহাদেরই একজন হইব—তবুও যে বাইশ হাজার সেনা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহাদের দলে রহিব না!"

গোলকুণ্ডার পতন

দুর্গে যখন ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ঝনা বাজিতে লাগিল, শত্রু ও মিত্রের ঘোর নাদে যখন গগন কম্পিত হইয়া উঠিল গোলকুণ্ডাপতি আবুল হাসান বালা হিসারের কক্ষে

আকুল চিত্তে পাদচারণ করিতে করিতে বুঝিলেন, যে তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আত্মীয় পরিজনদিগকে চিত্ত স্থির করিতে কহিলেন। পূর্ব্বাচরিত সকল অপরাধের জন্য সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং দৃঢ় পদে খাস দরবারে আসিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে মোগল সেনাপতি রুহুল্লা খাঁ দলবল লইয়া দরবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আবুল হাসানের শোণিতের জন্য তখন তাঁহাদের অসি ঝলক্ দিয়া উঠিল। গোলকুণ্ডা-পতি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মোগল সেনাপতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং তাঁহার সহিত প্রাতরাশ গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেও বিরত হইলেন না। মোগল সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রাতর্ভোজনের পর আবুল হাসান বন্দীকৃত হইয়া মোগল শিবিরে আনীত হইলেন। গোলকুণ্ডার পতন ঘটিল—দাক্ষিণাত্যে মোগল জয়পতাকা প্রতিদ্বন্দীহীন হইয়া উড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মারাঠা-মোগল

বালাহিসারে যেদিন মোগল পতাকা উড্ডীন হইল, সম্রাট আরাংজেব সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না যে মারাঠা-মূষিক তাঁহাকে নিয়ত দংশন করিতেছে। শিবাজি তখন আর জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পুত্র শম্ভুজির সেনা তখন দক্ষিণাপথের মোগল রাজ্যে সুবিধামত লুঠ-পাট করিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল শম্ভুজি সুরাপায়ী চরিত্রহীন শম্ভুজি—বিলাসী শম্ভুজি! তাঁহার চিত্ত তখন ব্যসনেই মত্ত ছিল। তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে দক্ষিণা পথে যে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, তাহা অচিরে তাঁহাকেও ধ্বংশ করিতে ছুটিবে! রাজা কুক্রিয়াশক্ত হইলেই রাজ্যে বিচ্ছৃঙ্খলা ঘটে। মহারাষ্ট্র রাজ্যেও তখন তাহাই ঘটিয়াছিল! ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে গোয়া অবরোধের পর হইতেই শম্ভুজি নারী ও সুরা লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গ দেখিলেন, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা যদি

শম্ভুজি

মোগলের নিকট পরাজিত হয়, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পতনও অবশ্যম্ভাবী। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাহায্যার্থ তাঁহারা তাই অর্থ ও সেবা পাঠাইতে লাগিলেন। যে মহারাষ্ট্র দেশকে পদলগ্ন করিবার ইচ্ছায় সম্রাট আরাংজেব কতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন—শিবাজি-হীন সেই দেশের ক্রীড়াপুত্তলী রাজার দুঃসাহস দেখিয়া সম্রাট মনে মনে জ্বলিতেছিলেন! বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার পতনের পর প্রতিহিংসা সাধনের সময় আসিল।

বিজাপুরে মহামারী

বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ছাড়াও সে সময়ে দক্ষিণাপথে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের নৃপতিরা সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না দেখিয়া, দলে দলে মোগল সেনা অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল। এক গোলকুণ্ডা লুণ্ঠন করিয়াই সম্রাট প্রভুত পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং প্রায় সাত কোটী টাকা পাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না যে সমগ্র দক্ষিণাপথই সোণার একটা খনি। সেই খনি সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাট জীবন পণ করিয়াছিলেন। নায়করাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন, আঙ্গোলি দুর্গ মোগলের হইল। সম্রাট তাহার প্রাচীন

নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম রাখিলেন—ইখ্‌তিয়াজ্‌-গড়। শাহজাদা আজম বীরবিক্রমে বেল্‌গাম দুর্গ জয় করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে বিজাপুরে সম্রাট শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। মোগলের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ষার অন্তেই বিজাপুরে ভীষণ প্লেগ বা মহামারী দেখা দিল (১৬৮৮ খৃঃ অঃ)। দলে দলে মোগল সেনা মরিতে লাগিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারাও জীবনের আশা ত্যাগ করিল। সম্রাটের প্রিয়তম পত্নী আরাঙ্গবাদী মহাল সেই মহাব্যাধির আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান-এত লোক মরিল যে কেহ কেহ বলেন মৃতের সংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না। মোগল সেনা জীবন্মৃত হইয়া রহিল। কিন্তু সম্রাট কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। মারাঠা শম্ভুজিকে পদানত করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল।

সম্রাটের পাদুকার পূজা

মারাঠা ভিন্ন তখন দক্ষিণাপথে সকলেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে সে সময়ে দক্ষিণাপথের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল যে দাম্ভিক মোগল সেনাপতিগণ সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে সম্রাটের পাদুকা রাখিয়া সমারোহে জনপদের পর জনপদে

ভ্রমণ করিতেন! হস্তি যখন যে রাজ্যের রাজার রাজধানীর নিকটে আসিত, তখনই তাঁহাকে নগরের বাহিরে আসিয়া সসম্মানে হস্তিসহ পাদুকাখানি রাজপুরে লইয়া যাইতে হইত। পাদুকার সম্মুখে রাজার রাজপতাকা অবনত করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং পাদুকাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন না করিলেই মোগল সেনা তৎক্ষণাৎ রাজধানী আক্রমণ করিত। রঙ্গ-কৃষ্ণ-নাইকর নামক জনৈক রাজা পাদুকার লাঞ্ছনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় সম্রাট এই পাদুকাপূজার প্রথা বন্ধ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই অদ্ভুত কাহিনীর স্থান নাই। সুতরাং ইহা ইংরাজ ঐতিহাসিকের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়।

শাহাজাদা আকবর।

সম্রাট আরাংজেব দেখিতেছিলেন যে দক্ষিণাপথে তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটী কণ্টক নিরন্তর বিঁধিতেছিল— একটী শাহাজাদা আকবর এবং অপরটী মারাঠা শম্ভুজি। শাহজাদা আকবর শম্ভুজির সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পিতৃরাজ্য গ্রাস করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। পরে কোনো কারণে শম্ভুজির সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল। বীর দুর্গাদাস কোনোরূপে সেই মনান্তর দূর করিয়াছিলেন বটে,

কবি-কুলেশ আবার সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাঙ্গা পাথর যেমন জোড়া লাগে না—শম্ভুজি ও আকবরেরও তেমনি আর মনের মিল হয় নাই! যাহা হউক, শাহজাদার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি শেষে হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একেবারে ইস্‌পাহান পলায়ন করিলেন (১৬৮৮ খৃঃ অঃ)। সম্রাটের একটী কণ্টক দূর হইল। তিনি তখন বিজাপুর হইতে রণ যাত্রা করিয়া মহারাষ্ট্র জনপদের দিকে অগ্রসর হইলেন।

শম্ভুজির দাম্ভিকতা ও দুর্ব্যবহারে মহারাষ্ট্রদেশে ধীরে ধীরে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। শম্ভুজি উহা গ্রাহ্যই করিলেন না। ক্রমে তাঁহার সহিত আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল। এ দিকের গোলকুণ্ডা সুলতানের বিশ্বাস হন্তা অমাত্য শেন নিজাম, এখন সম্রাট আরাংজেবের কৃপায় বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য স্বরূপ ছয়-হাজারি মনসবদারী এবং এক লক্ষ্য টাকা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে শম্ভুজির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। শার্কি-পরিবারের সহিত শম্ভুজির যে বিবাদ ছিল, তাহা মিটাইয়া শম্ভুজি তখন অলকনন্দা এবং বরুণার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর দুর্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই

সঙ্গমেশ্বরে শম্ভুজি

মন্ত্রী কবি-কুলেশ সেখানে সুন্দর কুঞ্জভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে নূপুর সিঞ্চনে মুখরিত হইয়া উঠিল—কুঞ্জভবনে বাণা বেণু বাজিতে লাগিল। সুরার তরঙ্গ অলকনন্দার তরঙ্গে মিশিল। হতভাগ্য শম্ভুজি সেই তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী দূত আসিয়া যখন সংবাদ দিল, মোগলের রণবাদ্য শুনা যাইতেছে, তখন সুরাপ্রমত্ত শম্ভুজি কহিলেন—"নির্ব্বোধ! ভয় দূর কর। মোগলের সাধ্য কি যে মহারাষ্ট্র পতিকে এইখানে আক্রমণ করে।"

শম্ভুজির পরাজয়

সেখ নিজাম—মকাররব খাঁ বাছা বাছা সেনা লইয়া কানন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার গিরিপথ পার হইতে কত সেনা নিহত এবং আহত হইয়া গেল। পদাতিকগণ ক্লান্তদেহে পিছাইয়া পড়িল। কিন্তু সেখ নিজাম শেষে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিনশত অশ্বারোহীসহ সঙ্গমেশ্বরে প্রবেশ করিলেন। কবি-কুলেশ দেখিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ৪।৫ হাজার ভল্লধারী সংগ্রহ করিয়া মোগলের পথ রোধ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহসা একটী তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া

কবি-কুলেশ অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাষ্ট্র সেনা যে-ই দেখিল যে সেনাপতি নাই, অমনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। শম্ভুজির পরাজয় ঘটিল।

শম্ভুজি ও মন্ত্রী কবিকুলেশ জীবন রক্ষার জন্য কবিকুলেশের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু গুপ্তচর সে সংবাদ সংগ্রহ করিল। সেখ নিজাম কালবিলম্ব না করিয়া কবিকুলেশের গৃহ ঘিরিলেন। তাঁহার পুত্র তখন কক্ষতলের গুপ্ত গহ্বর হইতে শম্ভুজি ও কবিকুলেশকে টানিয়া বাহির করিলেন। শম্ভুজির রাজত্বাভিনয় শেষ হইয়া গেল (১৬৮৯ খৃঃ অঃ)। সম্রাট আরাংজেব তখন বাহাদুর গড়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ শম্ভুজি বাহাদুর গড়ে আনীত হইলে পর সম্রাট তাঁহার নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া পরাজিত শত্রুর প্রতি যে ইতরজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কালিমামণ্ডিত স্মৃতিকে আরও কলঙ্ক মলিন করিয়া রাখিবে। সম্রাটের আদেশে শম্ভুজির রাজপরিচ্ছদ কাড়িয়া লওয়া হইল। তাঁহাকে নীচ জাতের বেশে সাজাইয়া, মুকুটের পরিবর্তে শিরে দীর্ঘাকার গাধার-টুপি পরাণো হইল! টুপীর গায়ে

ইতরের প্রতিহিংসা

ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধিয়া বন্দী শম্ভুজির ও কবিকুলেশকে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে তোলা হইল। উষ্ট্র মন্থরগতিতে সম্রাটের শিবিরের দিকে চলিতে লাগিল। উষ্ট্রের পশ্চাতে পশ্চাতে ভেরী ও ডঙ্কা বাজাইয়া রাজ-বাদকগণ অগ্রসর হইল। পথের উভয় পার্শ্বে শত সহস্র মোগল নাগরিক দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে করতালি দিতে লাগিল।

লাঞ্ছিত বন্দীকৃত শম্ভুজি যখন সম্রাটের সম্মুখে আসিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় সম্রাট তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পরে কারাগারে আবদ্ধ শম্ভুজির নিকট রাজদূত যাইয়া জানাইলেন যে তিনি তাঁহার রাজ্যটী সম্রাটের চরণে অর্পণ করিলে সম্রাট তাঁহার জীবন ভিক্ষা দিতে পারেন—শম্ভুজি তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—"সম্রাটকে কহিও, তিনি যেন তাঁহার দুহিতাকে দান করিয়া এই প্রার্থনা নিবেদন করেন!" সম্রাট এ কথা শুনিবামাত্রই শম্ভুজির দুইটী চক্ষু অন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। পরদিন মন্ত্রী কবি-কুলেশের জিহ্বা কর্ত্তিত হইল। তাহার পর একপক্ষ অতীত হইল। পক্ষকাল ঘোরতর নির্য্যাতন সহ্য করিবার পর শম্ভুজি ও

শম্ভুজির ভীষণ পরিণাম

কবি-কুলেশ ভীমা তীরে কোরগাঁও শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহাদের হস্ত ও পদ একে একে কাটিয়া দেহের মাংস ক্ষুধিত কুকুরের মুখে অর্পণ করা হইল। তাহার পর ছিন্নমুণ্ড শূলাগ্রে প্রোথিত করিয়া মোগল সেনাগণ দক্ষিণাপথের প্রধান নগর সমূহে জয় জয়নাদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জয়ঢাক ও ভেরিনাদে তাহাদের যাত্রাপথ মুখর করিয়া রাখিল।

শম্ভুজির মৃত্যু-সংবাদ অচিরে দেশমধ্যে প্রচারিত হইলে পর মহারাষ্ট্র দেশের রাজনেতাগণ বন্দী রাজকুমার রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কারণ শম্ভুজির পুত্র শাহু তখন বালকমাত্র ছিলেন।

সমগ্র-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট

মোগলের সহিত মারাঠার সমর লাগিল—সকল যুদ্ধেই মোগলের জয় হইতে লাগিল। শেষে শিবাজির ও শম্ভুজির বিধবা পত্নীগণ এবং অন্যান্য রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া সম্রাটের শিবিরে আনা হইল। সম্রাট আরাংজের শম্ভুজির বালক পুত্রকে রাজা উপাধি দিয়া সাত হাজার মনসবদার করিলেন বটে, কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আরাংজেব উত্তরভারত ও দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে বিঘোষিত হইলেন।

সম্রাট আরাংজেব সবই পাইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সবই হারাইতে আরম্ভ করিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা দেখা দিল। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য তখন এতই বৃহৎ হইয়া পড়িল যে সুদূর দিল্লীতে বসিয়া তাহার রক্ষা ও শাসনের সুবিধা রহিল না। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগিল। দীর্ঘকালব্যাপী দক্ষিণাপথ সমরে রাজকোষ একেবারেই শূন্য হইয়াছিল আর তাহার পূর্ণ করা তখন সম্ভব হইল না। দক্ষিণাপথ জয় করিবার পর সম্রাট আরাংজেব যে কয়বৎসর জীবিত ছিলেন মোগল-সাম্রাজ্যের শেষের আরম্ভ দেখিতে দেখিতেই তাহা কাটিয়া গেল। চিরকাল বিশ্ব-সংসারকে অবিশ্বাস করিয়া তিনি বিদায় লইলেন! তাঁহার অনুতপ্ত আত্মা আহম্মদনগরের প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল! ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ।

শেষের আরম্ভ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণাপথে ইংরাজ

সম্রাট আরাংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে বিবাদ আরম্ভ হইল, তাহারই ফলে ভারতের মানচিত্র আবার নূতনবর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। বেহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হাসনআলি ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আব্দুল্লা ক্রমে প্রবল হইয়া ভারতের রাজ-নির্ম্মাতারূপে পরিচিত হইলেন। সম্রাটবাহাদুর শা, জাহান্দার শা দারুকশিয়ার বা তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণ বুদ্বুদের মত উঠিয়া বুদ্বুদের মতই বিলয় প্রাপ্ত হইলেন। দক্ষিণাপথের মহারাষ্ট্ররাজ্য তখন অন্তর্বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। চিন্‌ক্লিস খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাপথে আবার যে মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন, তাহাই ইতিহাসে নিজামের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

ভাঙ্গা গড়া

যে দিন সেই কঙ্কন ব্রাহ্মণ প্রথম পেশোয়া বা মন্ত্রী বালাজি বিশ্বনাথ বিচ্ছিন্ন মহারাষ্ট্র রাজ্যকে সংহত করিয়া

নবশক্তি দান করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে পতিত মহারাষ্ট্রজাতির নবীন উত্থানের উষা দেখা দিল। দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও সেই নব-জাগ্রত মহারাষ্ট্র বল লইয়া দিকে দিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল। বাজিরাও স্থির করিলেন, মোগলের সমাধির উপর আসন স্থাপন করিয়া নবীন হিন্দু সাম্রাজ্য রচনা করিবেন। সেই সাম্রাজ্যের স্তম্ভরূপে নাগপুরে ভোঁসলা, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার এবং বরোদায় গায়কোয়াড় শক্তি স্থাপন হইয়া গেল। উত্থান ও পতনই জগতের নিয়ম। মোগলের দিন তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সহসা পারস্য ও আফগানিস্থানের সম্রাট নাদিরশাহ বিশাল ধূমকেতুরূপে ভারতগগনে দেখা দিলেন (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ)। দিল্লীনগরী শোণিত স্রোতে ভাসিয়া গেল। ৫৮ দিন রাত্র ভারতবর্ষে থাকিয়া নাদিরশাহ কোটী কোটী মুদ্রা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাট সাজাহানের ময়ূর সিংহাসন চিরদিনের মত ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া পড়িল!

নাদিরশাহ

রাজপুত, জাঠ, শিখ সকলেই আবার যখন ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল, দক্ষিণাপথের হিন্দুরাজ্য

মহীসুরও তেমনি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। মুসলমান বীর হায়দার আলি সেই সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতিরূপে জনপদের পর জনপদ জয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে মহারাষ্ট্র-শক্তি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পরাজয় লাভ করিল। এদিকে হায়দ্রাবাদের নিজামরাজ্য তখন এতই প্রবল হইতেছিল যে মহারাষ্ট্রগণ নিজামকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। কর্ণাটকে আর্কটের নবাব সে সময়ে স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণাপথের ন্যায় উত্তর-ভারতেও তখন নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে)।

হায়দারআলি

অনেক দিন হইতেই বৈদেশিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও দিনেমার দিগের প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ধ্বংস হইয়া গেল। রহিল কেবল ইংরাজ কোম্পানীবাহাদুর ও ফরাসী। মান্দ্রাজ বোম্বাই এবং কলিকাতায় দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজ কোম্পানীবাহাদুর ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্

কোম্পানী বাহাদুর
ফরাসী

ফরাসী ডুপ্লে এই সময়ে ভারতে ফরাসিরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, উহাই ইতিহাসে কর্ণাটক সমর নামে পরিচিত। আর্কটের নবাব আনোয়ার উদ্দীন এই যুদ্ধে এরূপ পরাজয় লাভ করিলেন যে বিজয়ী ফরাসী বণিক দক্ষিণাপথে বহুমানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। হায়দ্রাবাদের সুবাদারী লইয়া তখন যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পরিণতি ঘটিল ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই বৎসরেই পাণিপথের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র মিলিত শক্তি ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু হইয়া গেল। এই বৎসরেই ফরাসী রাজধানী পণ্ডিচেরি ইংরাজ কোম্পানীবাহাদুরের হস্তগত হওয়ায় ভারতে ফরাসি প্রতিষ্ঠার মন্দির বিচূর্ণিত হইয়া গেল। এই সময়েই দক্ষিণ-ভারতের মহীশূর রাজ্যগ্রহণ করিয়া অসীম প্রতাপশালী হায়দারআলি চারিদিকে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ হায়দারআলি একজন দস্যুরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু কোনো

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে

বিজ্ঞ ঐতিহাসিক কহিয়াছেন যে সেকালে হায়দারআলি ভারতের ফ্রেডারিক দি গ্রেট ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজের শক্তি দিনে দিনে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময় হইতে পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস, ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য রচনার ইতিহাস। সে ইতিহাসে দক্ষিণাপথের প্রধান ঘটনা দীর্ঘকালব্যাপী মহীশূর সমর এবং মহারাষ্ট্র সমর। ষষ্টিবর্ষ বয়সের বৃদ্ধ সমরক্লান্ত হায়দারআলি যখন প্রাণত্যাগ করিলেন (১৭৮২ খৃষ্টাব্দ) তখন দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ প্রবলভাবে চলিতেছিল। হায়দারের পুত্র টিপুসলতান ফরাসীদের সাহায্য লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধি হওয়ায় ভারতে ইংরাজ ফরাসি সংঘর্ষ থামিয়া গেল। ম্যাঙ্গোলেরে ইংরেজের সহিত টিপুর সন্ধি হইল (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে)। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। এদিকে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহাও নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরাজ মিত্র ট্রাভাঙ্কোরের রাজা যখন ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, তখন মহীশূরে

মহীশূর ও স্থলতান

আবার ইংরেজের সহিত টিপুর যুদ্ধ বাধিল। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা কর্ণওয়ালিশ হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহারাষ্ট্র দিগের সাহায্য লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনবৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর সেরিঙ্গাপট্টমে টিপুসুলতানের সহিত একটী সন্ধি সংঘটিত হইয়া গেল।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি এবং টিপুসুলতান

লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতে ইংরাজের কর্ণধার হইলেন তখন তিনি হীন শক্তি রাজন্য সকলকে কহিলেন যে তাঁহারা কোম্পানী বাহাদুরের পদানত রহিলে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। নিজামের সহিত তখন মহারাষ্ট্রদের বিবাদ চলিতেছিল। নিজাম কালবিলম্ব না করিয়া কোম্পানী-বাহাদুরের শরণ লইলেন। টিপুসুলতান তখনো ফরাসীদের সাহায্য লইয়া কোম্পানীবাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি প্রথমে টিপুসুলতানকে কোম্পানীর অধীন হইতে বলিবেন। কিন্তু সুল্‌তান তাহাতে সম্মত নহেন দেখিয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। এই যুদ্ধের নাম চতুর্থ মহীশূর সমর। মহারাষ্ট্র শক্তি ও নিজাম—দুইই টিপুর শত্রু ছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়াই নিজাম এবং মহারাষ্ট্র

উভয়েই কোম্পানীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। টিপু-স্থলতানের রাজধানী সেরিঙ্গাপট্টম ভীষণ যুদ্ধের পর বিজিত হইয়া গেল! শোণিত সিক্ত রণক্ষেত্রে টিপুর মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। টিপুর পিতা হায়দারআলি যে হিন্দুরাজার রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজে স্থলতান হইয়াছিলেন, কোম্পানীবাহাদুর সেই রাজ্য আবার হিন্দুরাজার করে অর্পণ করিলেন।

কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠা

মহারাষ্ট্রগণ যদিও নিজেদের স্থবিধার জন্য চতুর্থ মহীশূর সমরে ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে মহীশূর শক্তি ধূলি পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণাপথে কোম্পানী বাহাদুর ভিন্ন আর কেহ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—তখনই তাঁহারা কোম্পানী বাহাদুরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন! কিন্তু মহারাষ্ট্র শক্তি তখন আত্মকলহে অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল। যে বৎসর (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) দুর্দ্ধর্ষ পিণ্ডারিয়া কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল, সেই বৎসরেই মহারাষ্ট্র পেশোয়া, ভোঁস্‌লা এবং হোল্‌কার অস্ত্র ধরিলেন। কয়েকটি ভীষণ যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। পেশোয়ার সাম্রাজ্য

কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল। কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠার পথ এতদিনে একেবারেই মুক্ত হইল।তাঁহারাই তখন ভারতের রাজা রূপে পরিচিত হইলেন।

পিণ্ডারি ও মহারাষ্ট্রদিগের পতনের ৪০ বর্ষ মধ্যেই উত্তর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল অনল জ্বলিয়া উঠিল। সে কাহিনী বর্ণনা করিবার স্থান ইহা নহে। বিদ্রোহের অন্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিদ্রোহিদিগকে ক্ষমা করিয়া স্বয়ং ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্ব শেষ হইয়া ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীন হইয়া গেল। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর যে অপূর্ব্ব ঘোষণা-বাণী ভারতের নগরে নগরে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাই ভারতবর্ষের ম্যাগ্‌না চার্টা রূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

১লা নভেম্বর ১৮৫৮
